জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ড. ঈশানী চক্রবর্তী

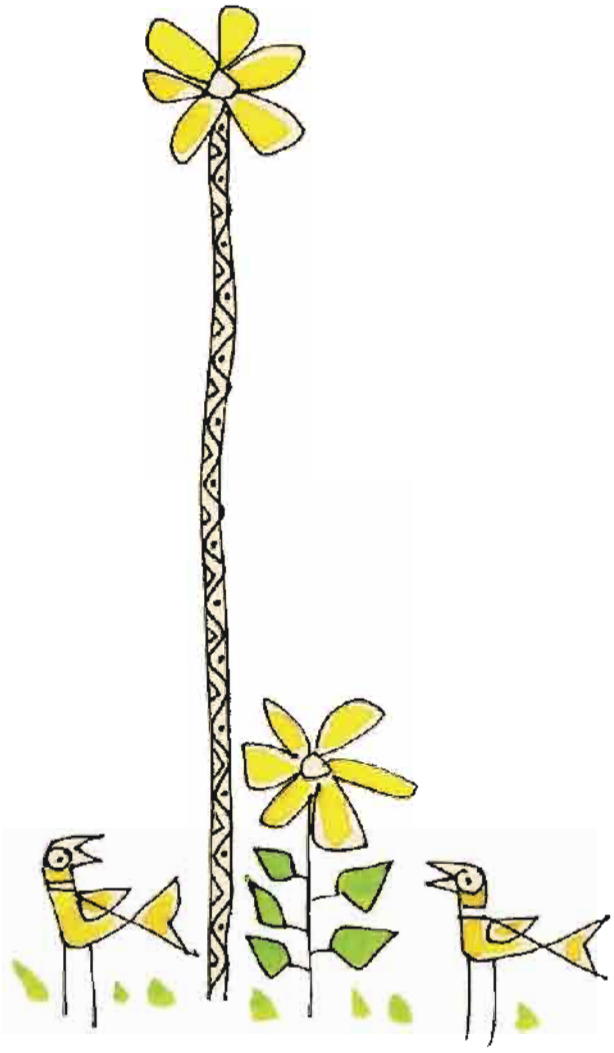

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

সমন্বয়ক
এস. এম. নূর-এ-এলাহী

গ্রাফিক্স
জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেতু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময় । তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই । শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ । শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মৌলিক চাহিদা, শিশুদের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য, সমাজে সকল মানুষের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ, সুনাগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জন, অন্যের সংস্কৃতি ও পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ, সামাজিক পরিবেশ ও দুর্যোগ, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া হলেও কোনো শিক্ষাক্রমে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা নির্ভর করে অন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর। বিশেষত শিক্ষকদের সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সাথে শিশুদের শেখানোর বিষয়টি জড়িত। তা সত্ত্বেও যুগের চাহিদা ও বাস্তবতার সাথে নতুন কিছু বিষয়ে যেমন– বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও দুর্যোগকে শিশু যাতে মোকাবেলা করতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। সমাজের সকল নারী-পুরুষ, পেশাজীবী, ধনী-দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করা ও সকলের সাথে সম্প্রীতির মানসিকতা তৈরি করার জন্য কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে।

শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি লক্ষ রেখে যুগোপযোগী বিষয়ে তাকে প্রয়োজনীয় ধারণা দেওয়া হয়েছে যাতে এ বিষয়ে তার সচেতনতা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়বস্তু যাতে সহজবোধ্য হয় এবং শিশু সেগুলো আনন্দের সাথে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, মুখস্ত করতে না হয়, সেসব দিক লক্ষ রেখে পরিকল্পিত কাজ ও রঙিন চিত্র দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, জাতির পিতার জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও তথ্যসমূহ সংবিধান সম্মতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিষয়ে শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও সংবিধান অনুসৃত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	১
দ্বিতীয়	আমাদের বাংলাদেশ: ইংরেজ শাসন	১৪
তৃতীয়	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন	২৩
চতুর্থ	বাংলাদেশের অর্থনীতি: কৃষি ও শিল্প	৩৪
পঞ্চম	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	৪৮
ষষ্ঠ	জলবায়ু এবং দুর্যোগ	৫৬
সপ্তম	মানবাধিকার	৬৫
অষ্টম	আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭১
নবম	আমরা সবাই সমান	৭৯
দশম	গণতান্ত্রিক মনোভাব	৮৩
একাদশ	নারী-পুরুষ সমতা	৮৮
দ্বাদশ	বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও তাদের সংস্কৃতি	৯৫
ত্রয়োদশ	বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব	১০৪

প্রথম অধ্যায়
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অত্যন্ত গৌরবময় ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা নিচের ছকে পড়ি ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন।
১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়।
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় গণহত্যা।
১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরু।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২৩ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে শাসন ও শোষণ করে। এই শাসন ও শোষণের হাত থেকে চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর আহ্বানেই বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যসহ সর্বস্তরের নারী-পুরুষ এই যুদ্ধে অংশ নেয়। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

মুজিবনগর সরকার গঠন

মুক্তিযুদ্ধের কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় প্রথম বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার

বৈদ্যনাথতলা (বর্তমান উপজেলা মুজিবনগর) গ্রামের আমবাগানে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সরকারের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দিন আহমদ

তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কারাগারে বন্দী। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং দেশে ও বিদেশে এই যুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা ও সমর্থন আদায় করার ক্ষেত্রে এই সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সরকার গঠনের পর থেকে অগণিত মানুষ দেশকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মুক্তিবাহিনী

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ১১ই জুলাই মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। কর্ণেল (পরবর্তিতে জেনারেল) মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। লে. কর্ণেল আব্দুর রব সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য এসময় সারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। নিচের মানচিত্রে এক নজরে ১১টি সেক্টরের অবস্থান দেখে নিই।

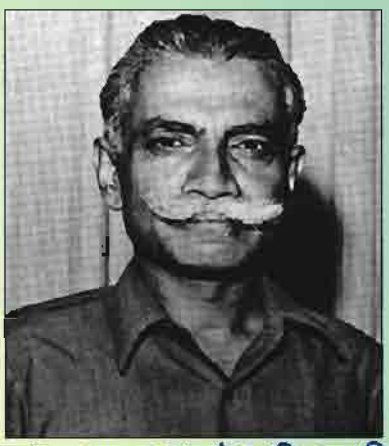

জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

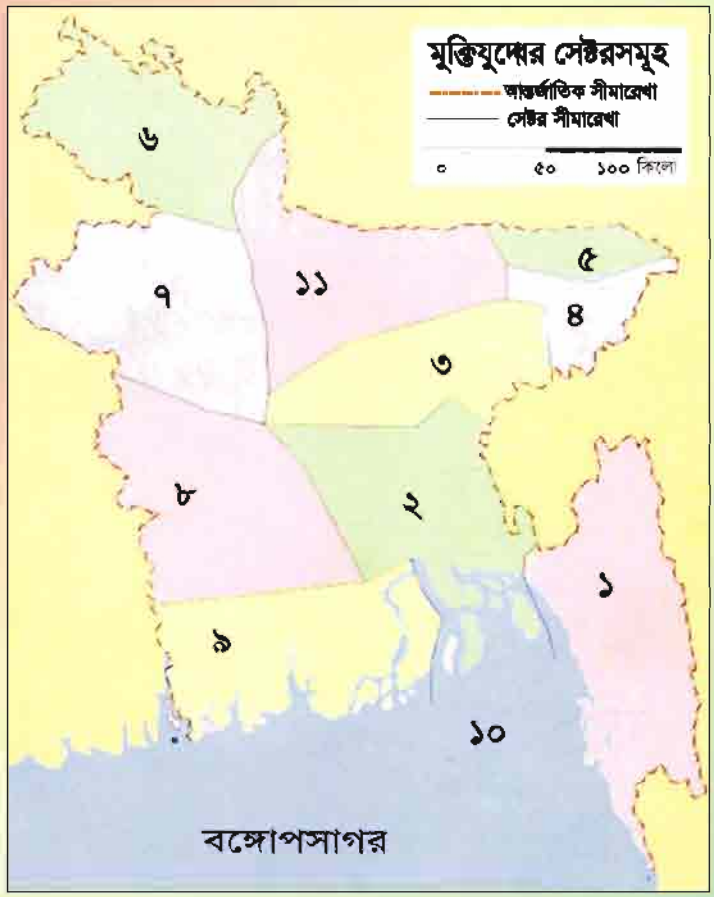

সেক্টর ১: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত।

সেক্টর ২: নোয়াখালী, কুমিল্লা, আখাউড়া, ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ।

সেক্টর ৩: আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্বদিকে কুমিল্লা জেলা, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।

সেক্টর ৪: সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাইউকি সড়ক।

সেক্টর ৫: সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা এবং সিলেট ডাইউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল।

সেক্টর ৬: ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও ঠাকুরগাঁও।

সেক্টর ৭: সমগ্র রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ছাড়া দিনাজপুরের অবশিষ্ট অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র পাবনা ও কুড়িগ্রাম জেলা।

সেক্টর ৮: সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অংশবিশেষ এবং দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা।

সেক্টর ৯: সাতক্ষীরা দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।

সেক্টর ১০: আভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, চট্টগ্রাম ও চালনা।

সেক্টর ১১: কিশোরগঞ্জ ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল।

সেক্টরগুলোর অধীনে ছিল বেশ কয়েকটি সাব-সেক্টর। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনকে ভাগ করা হয়েছিল তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে। এগুলো হলো 'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স' এবং 'কে ফোর্স'। মেজর জিয়াউর রহমান 'জেড ফোর্স', মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ 'এস ফোর্স' ও মেজর খালেদ মোশাররফ 'কে ফোর্স' এর অধিনায়ক ছিলেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে গঠিত হয় বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বি. এল. এফ।

সামরিক ও বেসামরিক জনগণের মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের নিয়ে গঠিত ছিল মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত বাহিনী। এদের বলা হতো 'মুক্তিফৌজ'। আর বেসামরিক সর্বস্তরের জনগণ নিয়ে গড়ে উঠেছিল অনিয়মিত বাহিনী। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক পর্যায়ে অন্যান্য বেশ কিছু ছোট ছোট বাহিনী গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে 'কাদেরিয়া বাহিনী' এবং মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার নেতৃত্বে 'মায়া বাহিনী' উল্লেখযোগ্য। দেশের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অনেক নারীও এসময় যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ যুদ্ধ ছিল প্রধান যুদ্ধ কৌশল। এভাবে যুদ্ধের নয় মাস ধরে মুক্তিবাহিনীর নির্ভীক সদস্যরা অদম্য প্রতিরোধ ও আক্রমণ গড়ে তোলে ।

যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাগণ

যুদ্ধের সময় এদেশের অগণিত সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মুক্তিবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । থাকা, খাওয়া, তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে লড়াই চালিয়ে যেতে তারা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন । এসব কাজে নারীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সংস্কৃতি কর্মীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরাও সক্রিয়ভাবে এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এভাবে সব বিপদ তুচ্ছ করে মুক্তিবাহিনী ও বাংলার অগণিত মুক্তিকামী জনতা শহরে, গ্রামে যে যেভাবে পেরেছিল রুখে দাঁড়িয়েছিল। সকলের মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপক রূপ লাভ করে।

নারী মুক্তিযোদ্ধা

'জয় বাংলা' ধ্বনি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এই স্লোগান দিয়ে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় উল্লাস প্রকাশ করত। এর মধ্য দিয়েই তাঁরা রণক্ষেত্রে একে অপরের অবস্থান সম্পর্কে জানাতো। 'জয় বাংলা' ধ্বনি শুনলে পাক হানাদারদের বুক ভয়ে কেঁপে উঠতো।

পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ

যুদ্ধের প্রথম থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি নিধনে চরম নিষ্ঠুরতার পথ অবলম্বন করে। ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরীহ বাঙালিদের উপর অতর্কিত হামলার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এই অভিযানের নাম দেয়া হয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। সেদিন এক রাতেই ঢাকাসহ সারাদেশে হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। পরবর্তী নয় মাস ধরেই পাকিস্তানি বাহিনীর এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকে। পাশাপাশি তারা চালায় নির্বিচার লুটতরাজ ও ধর-পাকড়।

গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দেয়নি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে সারাদেশের অগণিত স্থানকে বধ্যভূমিতে পরিণত করে। পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের মুখে প্রাণভয়ে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এসময় প্রায় এক কোটির বেশি মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়।

লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাচ্ছে

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। তারপরেও এদেশের কিছু মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করে। এদের কয়েকটি প্রধান সংগঠনের মধ্যে ছিল শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস। এরা মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সাধারণ মানুষের নামের তালিকা তৈরি করে হানাদারদের দিয়েছিল। এছাড়া পথ-ঘাট চিনিয়ে, ভাষা বুঝিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে নির্যাতন-তান্ডব চালাতে সাহায্য করে। এদের অত্যাচার কখনো কখনো পাকিস্তানি বাহিনীকেও হার মানিয়েছিল।

পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের অত্যাচার নির্যাতন

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসররা এদেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা করে। ১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে তারা আমাদের অনেক জ্ঞানী-গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। এদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক রাশীদুল হাসান, সাংবাদিক সেলিনা পারভিন, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. গোলাম মর্তুজা, ডা. আজহারুল হক এবং আরও অনেকে। এসব শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আমরা প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করি।

অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা

অধ্যাপক রাশীদুল হাসান

সাংবাদিক সেলিনা পারভিন

ডা. আলীম চৌধুরী

ডা. আজহারুল হক

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শেষ রক্ষা হয়নি। আমাদের লড়াকু মুক্তিবাহিনীর একের পর এক আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসের দিকে যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করে। যুদ্ধের শুরু থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আমাদের অনেক সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছিল। বিশেষকরে প্রাণভয়ে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের ভারত সরকার খাদ্য, বস্ত্র ,

আশ্রয় এবং চিকিৎসা সেবা দিয়ে সাহায্য করে। যুদ্ধের শেষের দিকে তারা সামরিক শক্তি দিয়েও সহায়তা করে। যুদ্ধকালীন ভারতীয় এই সহায়তাকারী বাহিনীকে মিত্রবাহিনী বলা হতো। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর একটি যৌথবাহিনী গঠন করা হয়। পাকিস্তান ৩রা ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করলে, যৌথবাহিনী একযোগে স্থল, নৌ ও আকাশ পথে আক্রমণ করে। তীব্র আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকালে পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী যৌথ বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে দলিলে স্বাক্ষর করেন। জন্ম লাভ করে 'বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন স্বাধীন দেশ। সেই থেকে প্রতিবছর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় দিবস পালন করি।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি

মাত্র নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে একটি দেশের স্বাধীন হওয়ার ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু সময় অল্প হলেও, এই যুদ্ধ ছিল রক্তক্ষয়ী। সম্পদ হানি ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি ছিল সীমাহীন ও অপূরণীয়। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ এতে প্রাণ হারায়, আহত হয় আরও কয়েক লক্ষ মানুষ। এক কোটির অধিক মানুষ ঘর ছাড়া হয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা অগণিত বাড়ি-ঘর, দোকানপাট পুড়িয়ে দেয় । ধ্বংস করে রাস্তা-ঘাট, সেতু ও বন্দর । বন্ধ হয়ে যায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, অফিস, কারখানা ইত্যাদি। সবমিলিয়ে 'সোনার বাংলা' প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই দেশটি পেয়েছি। এর ফলেই পৃথিবীর বুকে আজ আমরা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমরা পেয়েছি নিজস্ব একটা ভূ-খণ্ড, একটা নিজস্ব পতাকা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ তাই সবার। এই স্বাধীন দেশে তাই সবার রয়েছে সমান অধিকার। এই দেশটাকে সুন্দর করে গড়ার দায়িত্বও আমাদের সবার।

সেই সাথে মনে রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধে বহু মানুষের আত্মত্যাগের কথা। ভুললে চলবে না সেসব লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার কথা যাঁরা জীবনপণ করে যুদ্ধ করেছিলেন, শহিদ হয়েছেন বা আহত হয়ে বেঁচে আছেন। সাধারণ মানুষ যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন তাদের অবদানও অনেক। মুক্তিযোদ্ধাদের মতো আমরাও সবসময় দেশকে ভালোবাসব।

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় উপাধি

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কতগুলো বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় উপাধি প্রদান করেছে। এগুলো হলো :

১. **বীরশ্রেষ্ঠ:** এটি সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পুরস্কার। মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছেন এটি তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত সাত জন এ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

২. **বীর-উত্তম:** মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য প্রদত্ত এটি দ্বিতীয় বীরত্বসূচক পুরস্কার।

৩. **বীর-বিক্রম:** মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য দেয়া এটি তৃতীয় বীরত্বসূচক পুরস্কার।

৪. **বীর-প্রতীক:** মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য এটি চতুর্থ বীরত্বসূচক পুরস্কার।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য মানুষ অবদান রেখেছেন। আমরা তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা করি।

আবার পড়ি

১. ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় প্রথম বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। একে মুজিবনগর সরকারও বলা হয়।

২. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়।

৩. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর এবং রণাঙ্গনকে ৩টি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়।

৪. সামরিক ও বেসামরিক জনগণের মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক বাহিনী ছিল। এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা।

৫. ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে নারী-পুরুষের মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

৬. ১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস'।

৭. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এটি আমাদের বিজয় দিবস।

৮. মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান।

৯. 'বীরশ্রেষ্ঠ', 'বীর-উত্তম', 'বীর-বিক্রম', 'বীর-প্রতীক' মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় বীরত্বসূচক উপাধি।

পরিকল্পিত কাজ

১. নিচের ছকটি পূরণ করা

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বাহিনীর নাম	মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের বাহিনীর নাম
ক.	ক.
খ.	খ.
গ.	গ.

২. মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংগ্রহ করে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যৌথভাবে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ভূমিকাভিনয়।

৪. মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের ছবি সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করা।

৫. ক্লাসে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা শোনা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ মুজিবনগর সরকার শপথ নিয়েছিল কবে ?

ক. ২৫শে এপ্রিল ১৯৭১ খ. ১০ই এপ্রিল ১৯৭১

গ. ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ ঘ. ২০শে এপ্রিল ১৯৭২

১.২ মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন ?

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

গ. তাজউদ্দিন আহমদ ঘ. মওলানা ভাসানী

১.৩ জেড ব্রিগেড ফোর্সের অধিনায়ক কে ছিলেন ?

ক. মেজর কে. এম শফিউল্লাহ খ. মেজর জিয়াউর রহমান

গ. মেজর খালেদ মোশাররফ ঘ. কর্ণেল ওসমানী

১.৪ কোনটি শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ?

ক. ৭ই মার্চ খ. ২৬শে মার্চ

গ. ১৭ই এপ্রিল ঘ. ১৪ই ডিসেম্বর

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ———————— ।

খ. মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল সামরিক ও বেসামরিক ———————— মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

গ. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ———————— লক্ষ মানুষ নিহত হয়।

ঘ. মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে ১৯৭১সালের ২১শে নভেম্বর একটি ———————— বাহিনী গঠন করা হয়।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি	লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
খ. মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সহযোগী দেশীয় বাহিনী	কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী
গ. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান	রাজাকার
ঘ. যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন	বীর-বিক্রম
	বীরশ্রেষ্ঠ

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. মুজিবনগর সরকার কখন ও কোথায় গঠিত হয়েছিল ? এ সরকারে কারা ছিলেন ?

খ. আমাদের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. কাদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল ?

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ কীভাবে অংশ নিয়েছিলেন ?

ঙ. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী কী ধরনের নির্যাতন-তাণ্ডব চালিয়েছিল ?

চ. ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয় কেন ?

ছ. মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের বাংলাদেশ: ইংরেজ শাসন

বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে বাংলায় ইংরেজদের আগমন ঘটে। ইংরেজরা ছাড়াও পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরাও বাণিজ্য করতে এদেশে এসেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই এরা ক্রমশ স্থানীয় রাজনীতি ও শাসন কাজে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এসব ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে ইংরেজরাই শেষাবধি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। এর ফলে বাংলা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারায়। এই শাসন বাংলার সমাজ, সংস্কৃতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রায় দুশো বছর ধরে (১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭খ্রি:) ইংরেজরা এদেশে রাজত্ব করে।

পলাশীর যুদ্ধ

সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তিনি নবাব আলিবর্দী খাঁ এর দৌহিত্র ছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে বাংলার নবাব হন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করেই তরুণ নবাবকে নানা ষড়যন্ত্র ও বিরোধী শক্তির মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর সামনে একদিকে ছিল ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তি, আর অন্যদিকে বড় খালা ঘসেটি বেগম, সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের মতো ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র । এর সাথে যুক্ত হয়েছিল রায় দুর্লভ এবং জগৎ শেঠের মতো প্রভাবশালী বণিকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র । এসময় বাংলায় ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য সংস্থার নাম ছিল বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। নানা কারণে নবাবের সাথে ইংরেজ বণিকদের বিরোধ দেখা দেয়। ইংরেজদের সাথে নবাব বিরোধী শক্তিগুলো একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

এরা সবাই নবাবকে উৎখাতের চেষ্টা করতে থাকে। এসবের জের ধরে শেষাবধি ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ইংরেজ শক্তির সাথে নবাবের সৈন্যদের পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন ও পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমেই বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

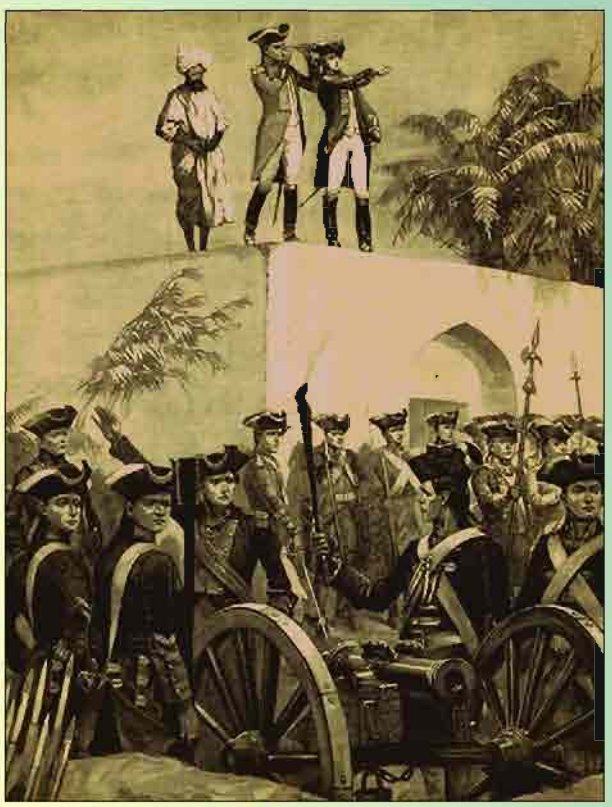

পলাশীর যুদ্ধ

ইংরেজ শাসন

শাসনকাজে অভিজ্ঞতা না থাকায় ইংরেজ বণিকরা সাথে সাথেই নিজেদের হাতে শাসনভার তুলে নেয় নি। তাদের কথা শুনবে এমন দেশীয় লোকদের দ্বারা শাসন কাজ চালায়। তারা প্রথমে মীর জাফর ও পরে মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম ছিলেন কিছুটা স্বাধীনচেতা। ফলে ইংরেজদের সাথে তাঁর দুবার যুদ্ধ হয়। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। এরপর থেকেই ইংরেজরা পুরোপুরি ক্ষমতা দখল শুরু করে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশ বছর এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলে, যা ইতিহাসে কোম্পানির শাসন নামে পরিচিত। কোম্পানির প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন লর্ড ক্লাইভ। প্রায় একশ বছর পরে ১৮৫৭ সালে কোম্পানির নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করলেও শাসনব্যবস্থা আর আগের মতো চলতে পারে নি। কোম্পানির শাসন রদ করে ১৮৫৮ সালে বাংলাসহ ভারতের শাসনভার বৃটিশ সরকার সরাসরি নিজ হাতে তুলে নেয়, যা চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

এদেশে ইংরেজ শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি। তারা এদেশের মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, অঞ্চলভেদে যেসব পার্থক্য ছিল তার ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করত এবং তারা একজনকে অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করত।

বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রভাব

এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শোষণ ও নিজেদের লাভ। প্রায় দুশো বছরের এই শাসনকালে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ এদেশ থেকে পাচার হয়ে যায়। বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি ও এক কালের তাঁতশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। বাংলার শিল্প, বাণিজ্যও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসংখ্য কারিগর বেকার হয়ে যায়। কোম্পানি শাসনের সময়ে ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

এসময় বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল কৃষক ও দরিদ্র। অন্যদিকে অল্পসংখ্যক জমিদার শ্রেণি ছিল ধনী ও বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী। নারীদের অবস্থা একেবারেই পিছিয়ে ছিল। এমন পরিস্থিতিতে ইংরেজদের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়। শিক্ষা বিস্তারে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফের প্রচলনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়। ছাপাখানার বিকাশে জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ বাড়ে। আধুনিক ও ইংরেজি শিক্ষার ফলে এদেশে ক্রমে একটা ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে ওঠে। এদের একাংশের মধ্যে নতুন চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। এরা নিজেদের সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত নানা কুসংস্কার, কুপ্রথা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। এদের হাত ধরেই উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে। যার ফলে সামাজিক সংস্কারসহ, শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। নব জাগরণের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ। মুসলমানদের সামাজিক সংস্কার ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ।

রাজা রামমোহন রায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

নবাব আবদুল লতিফ

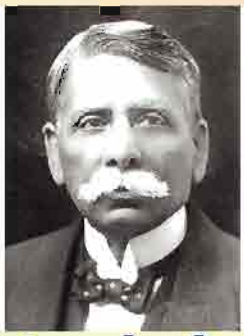
সৈয়দ আমীর আলী

ইংরেজ শাসন বিরোধী আন্দোলন

বিদেশি ইংরেজ শাসনকে বাংলার মানুষ কিন্তু বিনা প্রতিরোধে মেনে নেয় নি। আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলায় একাধিক প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার গল্প এখনো মুখে মুখে ফেরে। ইংরেজ ও জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে তিনি বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার নারকেলবাড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি মারা যান।

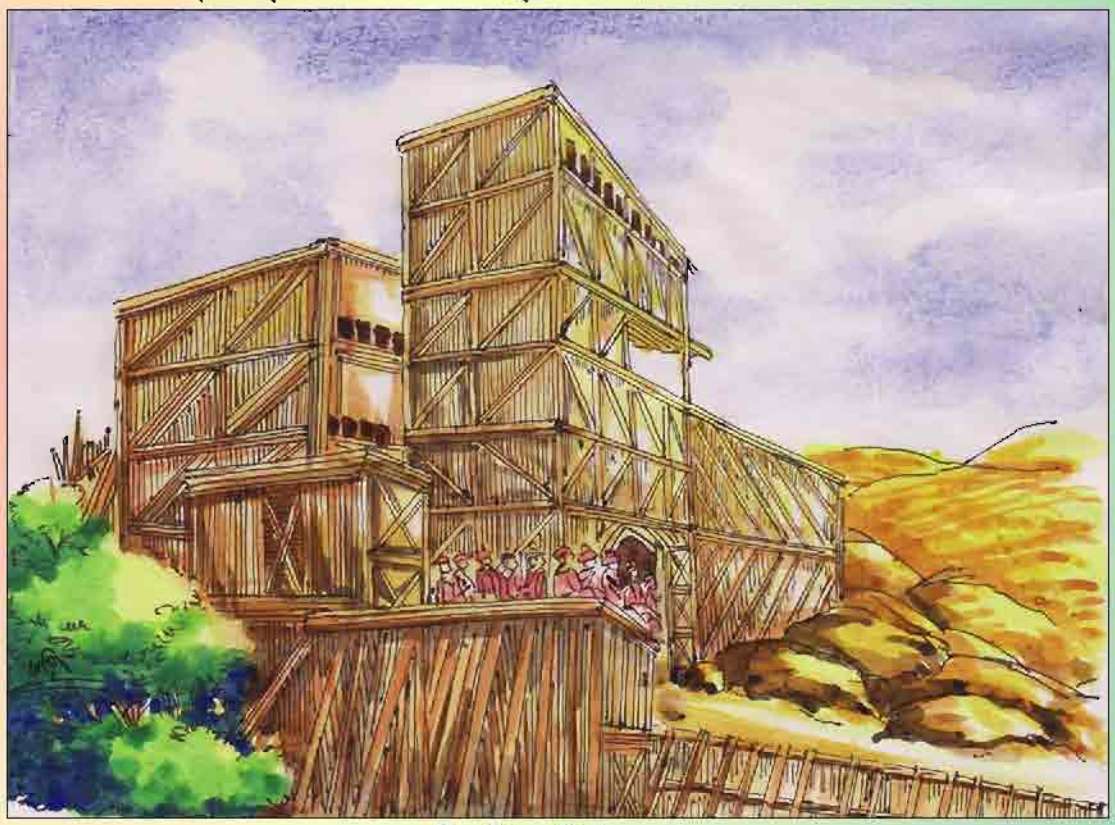

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ছিল প্রথম বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। বাংলায় শুরু হয়ে ইংরেজ অধিকৃত ভারতের অন্যান্য এলাকার সিপাহিদের মধ্যেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম বাংলার ব্যারাকপুরে সিপাহি 'মঙ্গল পান্ডের' নেতৃত্বে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয়। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করে। নিরপরাধ বহুজনকে এসময় নির্বিচারে

ফাঁসি দেয়া হয়। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে সে সময় বাংলার বিদ্রোহী সিপাহিদের ফাঁসি দেয়া হয়। বিদ্রোহীরা পরাজিত হলেও এই বিদ্রোহের ফলেই কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। শুরু হয় বৃটিশরাজ তথা রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন।

বাহাদুর শাহ পার্কে নির্মিত সৌধ

আধুনিক শিক্ষা ও নবজাগরণের ফলে উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে । এরই ফলে একসময় ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯০৫ সালে তৎকালীন বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলায়। ফলে ইংরেজরা ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। এই পটভূমিতে মুসলমান সমাজের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে ১৯০৬ সালে ঢাকায় ভারতীয় মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশি চেতনার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। যার ফলে স্বরাজ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সশস্ত্র যুব বিদ্রোহ ঘটে। এ পর্যায়ে সশস্ত্র আন্দোলনে ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্যসেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা চিরস্মরণীয়। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নেওয়ার কারণে ক্ষুদিরাম ও মাস্টারদাকে ফাঁসি দেওয়া

সূর্যসেন

প্রীতিলতা

ক্ষুদিরাম

হয়েছিল। আর সফল অভিযান শেষে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়া এড়ানোর জন্য প্রীতিলতা স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে একাধিক উল্লেখযোগ্য বাঙালি নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, শের-ই-বাংলা এ. কে ফজলুল হক প্রমুখ। এসব বহুমুখী ও ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই ইংরেজরা একসময় এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। এসময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর লেখনীর মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীকার চেতনা আরও বেগবান হয়। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ সময় নারী শিক্ষা বিস্তারে নিরলস পরিশ্রম করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ববাংলা অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ সে সময় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

শের-ই-বাংলা এ. কে ফজলুল হক

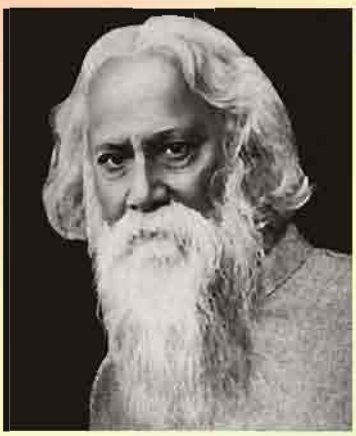

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজী নজরুল ইসলাম

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

আবার পড়ি

১. ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ হয়।
২. ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়। বাংলায় এ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সিপাহি মঙ্গল পান্ডে।
৩. ইংরেজরা এদেশে প্রায় দুশো বছর (১৭৫৭–১৯৪৭ খ্রি:) রাজত্ব করে।
৪. ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ববাংলা বা আজকের বাংলাদেশ সে সময় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরিকল্পিত কাজ

১. নিচের ছক পূরণ কর।

১ . ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	
২. পলাশীর যুদ্ধের সন ও তারিখ	
৩. ১৮৫৭ সাল	
৪. বিদ্যাসাগর কী করেছিলেন ?	
৫. ১৯৪৭ সাল	

২. নিচের ছকে সংশ্লিষ্ট তিনজন ব্যক্তির নাম লিখ।

সমাজ সংস্কারক	রাজনীতিবিদ/বিপ্লবী
ক.	ক.
খ.	খ.
গ.	গ.

৩. ইংরেজ শাসনামলের প্রধান ঘটনাবলী নিয়ে চার্ট তৈরি করা।
৪. ভূমিকাভিনয়: সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ কবে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ?

ক. ১৭৫৫ সালের ১লা জানুয়ারি খ. ১৭৫৬ সালের ২৩শে জুন

গ. ১৭৫৬ সালের ৩০শে অক্টোবর ঘ. ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন

১.২ ১৯০৫ সালে কী হয়েছিল ?

ক. সিপাহি বিদ্রোহ খ. বাংলা ভাগ

গ. ভারত বিভক্তি ঘ. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

১.৩ কে নবজাগরণের সাথে যুক্ত ছিলেন ?

ক. ক্ষুদিরাম খ. চিত্তরঞ্জন দাশ

গ. তিতুমীর ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১.৪ কোন সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় ?

ক. ১৯৪৫ খ. ১৯৪৭

গ. ১৯৪৯ ঘ. ১৯৫০

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ ———————— নবাব ।

খ. প্রায় ———————— বছর ধরে ইংরেজরা এদেশে রাজত্ব করে।।

গ. ১৮৫৭ এর সিপাহি বিদ্রোহ ছিল বড় আকারে সংঘটিত প্রথম বৃটিশ বিরোধী ———————— সংগ্রাম।

ঘ. আধুনিক শিক্ষা ও নবজাগরণের ফলে ———————— চেতনার বিকাশ ঘটে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. কোম্পানির শাসনামল	লর্ড ক্লাইভ
খ. ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম শাসনকর্তা	নারকেলবাড়িয়ায়
গ. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা অবস্থিত	১৭৫৭–১৮৫৭ খ্রি:
ঘ. প্রীতিলতা অভিযান করেছিলেন	পাকিস্তানের বিরুদ্ধে
	ইংরেজদের বিরুদ্ধে

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. পলাশীর যুদ্ধ কেন হয়েছিল ? এ যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল ?

খ. বাংলার শিক্ষা ও অর্থনীতিতে বৃটিশ শাসনের প্রভাব কী ছিল ?

গ. ১৮৫৭ এর সিপাহি বিদ্রোহের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঘ. বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তিতুমীর, সূর্যসেন, প্রীতিলতা ও ক্ষুদিরাম কী অবদান রেখেছিলেন ?

ঙ. বাংলায় নবজাগরণের ফলাফল কী ছিল ?

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন থেকে এদেশে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ বসবাস করে আসছে। অনেক শাসক রাজত্ব করেছেন। সৃষ্টি হয়েছে অনেক ঐতিহাসিক স্থান। দেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে এসবের নানা নিদর্শন। আমরা এখন কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সম্পর্কে জানব।

মহাস্থানগড়

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের বিশেষ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক স্থান। এটি খ্রিস্টপূর্ব চার শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের বাংলার ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। এখানে বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও বৃহৎ নগর 'পুন্ড্রনগর' এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এ নগর মৌর্য আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি বগুড়া শহর থেকে তেরো কিলোমিটার উত্তরে

মহাস্থানগড়

করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানে বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। মহাস্থানগড়ের মাটি খুঁড়ে অনেকগুলো ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে একটি 'ব্রাহ্মী শিলালিপি' পাওয়া গেছে। এটি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি। এখানে পোড়া মাটির ফলক ও ভাস্কর্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, পাথর ও কাঁচের পুঁতি পাওয়া গেছে। এখানে 'গোবিন্দ ভিটা' 'লক্ষিন্দরের মেধ' ও 'গোকুল মেধ' নামে ধর্মীয় পুরাকীর্তি রয়েছে। প্রাচীনকালের একটি দুর্গ ভাঙা অবস্থায় এখনো দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গটির পূর্বদিকে করতোয়া নদী এবং অপর তিন দিকে চওড়া খাদের চিহ্ন রয়েছে। দুর্গের ভেতর এখানে সেখানে অনেকগুলো পাথরের খণ্ড রয়েছে। 'খোদাই পাথর' নামে পরিচিত এক টুকরা বিশেষ ধরনের পাথর পাওয়া গেছে। এই পাথর টুকরাটি প্রায় ৩.৩৫ মিটার লম্বা ও ০.৯১ মিটার চওড়া। মহাস্থানগড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মুঘল আমলে নির্মিত এক গম্বুজের একটি মসজিদ রয়েছে। এটি 'মহাস্থান মসজিদ' নামে পরিচিত।

এখন আমরা মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে এমন চারটি নিদর্শনের নাম নিচের ছকে লিখি।

১.	২.
৩.	৪.

মহাস্থানগড়ের অনেক নিদর্শন এখানকার যাদুঘরে রাখা হয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু নিদর্শন রাজশাহীর বরেন্দ্র যাদুঘরে এবং ঢাকার জাতীয় যাদুঘরে রাখা হয়েছে।

ওয়ারী-বটেশ্বর

ওয়ারী ও বটেশ্বর নরসিংদী জেলার পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এখানে কয়েক বছর আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি 'ওয়ারী-বটেশ্বর' নামে পরিচিত। এটি মহাস্থান গড়ের মতো বাংলার একটি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন। ধারণা করা হয়, চার খিষ্টপূর্ব অব্দে মৌর্য যুগে এখানে একটি সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে এ অঞ্চলটি যুক্ত ছিল। এখানকার কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় ছাপাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। এছাড়া পাথরের অনেকগুলো হাতিয়ার ও গুটিকা পাওয়া গেছে। ওয়ারী-বটেশ্বর অনুসন্ধান কাজ এখনো চলছে। আগামীতে অনেক নতুন নতুন নিদর্শন পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

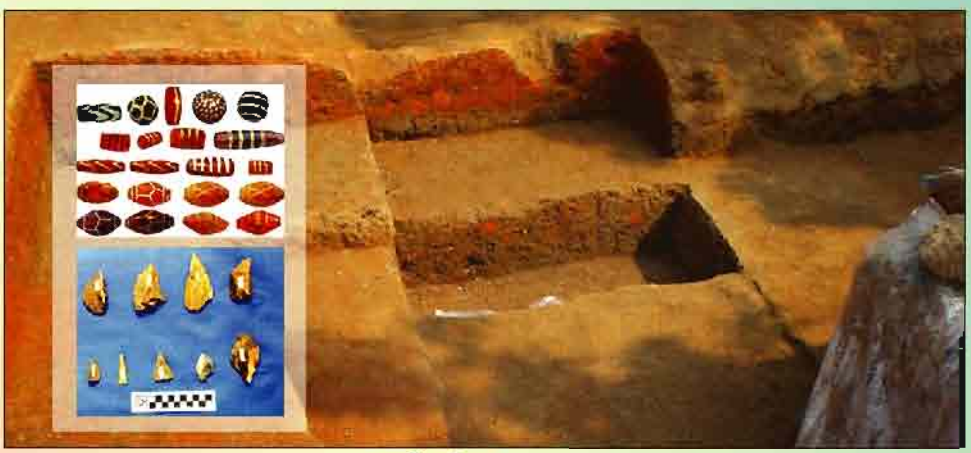

ওয়ারী-বটেশ্বর

পাহাড়পুর

পাহাড়পুর রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলায় অবস্থিত। এখানে পাল বংশের রাজাদের আমলের প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ প্রত্নস্থলটি প্রায় ২৪ মিটার উঁচু এবং ০.১০ বর্গকিলোমিটার বা ১০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। পাহাড়পুরের

পাহাড়পুরের পুরাকীর্তি

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তিটি 'সোমপুর মহাবিহার' নামে পরিচিত। রাজা ধর্মপালের শাসনামলে (আনুমানিক ৭৮১–৮২১ খ্রিঃ) এটি নির্মিত হয়। এই বিহারের চারদিকে

১৭৭টি কুঠুরী রয়েছে। মাঝখানে সুউচ্চ একটি মন্দির রয়েছে। তার চারপাশে রয়েছে অনেকগুলো ছোট মন্দির এবং পুকুর। এছাড়া রন্ধনশালা, ভোজনশালা, পাকা নর্দমা ও কূপের নিদর্শন রয়েছে। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে পোড়া মাটির বেশকিছু মূর্তি ও চিত্র পাওয়া গেছে। এগুলোর বেশির ভাগ বাংলার জীবজন্তুর মূর্তি। এছাড়াও চুনবালি ও ধাতব মূর্তিও পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরের পুরাকীর্তি প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর অন্যতম। প্রতিবছর অনেক দেশি-বিদেশি পর্যটক পাহাড়পুর ভ্রমণে যান। ভ্রমণকারীদের জন্য এখানে একটি যাদুঘর ও বিশ্রামাগার রয়েছে।

এখন আমরা পাহাড়পুরের মাটি খুঁড়ে যে সব নির্দশন পাওয়া গেছে তার চারটি উল্লেখ করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

১.	২.
৩.	৪.

ময়নামতি

কুমিল্লা শহর থেকে আট কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ময়নামতি অবস্থিত। রাজা মাণিক চন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনী এ জায়গার সঙ্গে জড়িত। ময়নামতির প্রত্ন নিদর্শনসমূহ আট থেকে বারো শতক পর্যন্ত প্রায় চারশত বছরের দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। এখানে অনেকগুলো প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে 'শালবন বিহার', 'কুটিলা মুড়া', 'রানির বাংলো', 'আনন্দ বিহার', 'রূপবান মুড়া', 'ভোজ বিহার', ও 'ময়নামতি ঢিবি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলোতে বাংলার বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন ছাড়াও এখানে জৈন ও হিন্দু দেব-দেবীর অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে।

এখানকার নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে, সে আমলে এখানে বিদ্যাচর্চার সুব্যবস্থা ছিল। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থারও নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার মন্দিরগুলো কারুকার্য মন্ডিত ছিল। মন্দিরের বাইরের দেয়াল ও অন্যান্য ঘরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করা হতো। পোড়ামাটির ফলকে অলৌকিক জীব ও পৌরাণিক দৃশ্য রয়েছে। এছাড়া বাস্তব অনেক দৃশ্য ও মূর্তি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সিংহ, বেজীর সঙ্গে যুদ্ধরত গোখরা সাপ, ঘোড়া, আগুয়ান হাতি, পদ্মে মুখ দেওয়া

ময়নামতি

রাজহাঁস ইত্যাদি দৃশ্য বিশেষ আকর্ষণীয়। তদুপরি ঢাল-তলোয়ার হাতে যোদ্ধা, নাচের ভঙ্গিতে নারী-পুরুষ ইত্যাদির দৃশ্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ময়নামতিতে অনেক সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এছাড়া পাথরের ভাস্কর্য ও পোড়া মাটির লিপি ফলক পাওয়া গেছে।

আমরা এখন ময়নামতিতে পাওয়া নিদর্শনগুলোর কয়েকটির নাম নিচের ছকে লিখি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

ময়নামতিতে একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ যাদুঘরে অনেক নিদর্শন রাখা হয়েছে।

সোনারগাঁও

সোনারগাঁও আমাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। ঢাকা শহর থেকে প্রায় সাতাশ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে সোনারগাঁও অবস্থিত। বর্তমানে সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। মধ্যযুগে মুসলিম শাসন আমলে বেশ কিছুকাল এখানে বাংলার সুলতানদের রাজধানী ছিল। মুঘল আমলের বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঈসা খাঁ এবং তাঁর পুত্র মুসা খাঁর রাজধানী ছিল এখানে। এটি সে আমলের প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল।

পানাম নগর

সেসব গৌরবময় দিনের কিছু নিদর্শন বর্তমান সোনারগাঁয়ে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। নিদর্শনগুলোর মধ্যে বিরাট আকারের দীঘি, মাটির স্তূপ, ধ্বংসপ্রাপ্ত কেল্লা, মসজিদ এবং পানাম নগরের ধ্বংসাবশেষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ এর মাজার

এখানে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মাজার রয়েছে। এছাড়া রয়েছে পাঁচ পীরের মাজার।

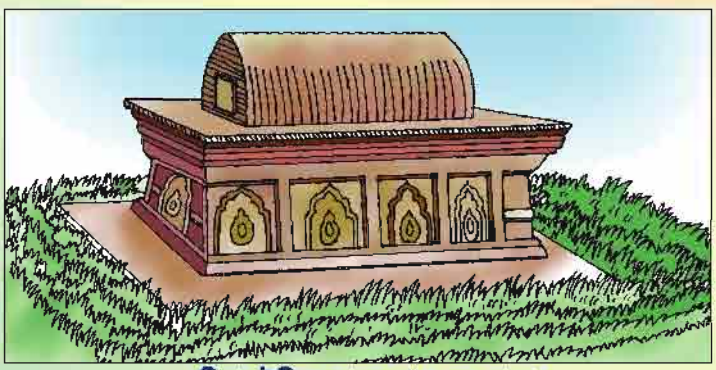

গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ এর মাজার

মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকা রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলে সোনারগাঁর গুরুত্ব ধীরে ধীরে লোপ পায়।

সোনারগাঁও লোকশিল্প যাদুঘর

সোনারগাঁয়ের গৌরব ধরে রাখার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ১৯৭৫ সালে এখানে একটি লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন।

লালবাগ দুর্গ

লালবাগ দুর্গ আমাদের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি বর্তমান পুরানো ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বুড়িগঙ্গা নদীর নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। ১৬৭৮ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম

লালবাগ দুর্গ

ঢাকার সুবেদার থাকাকালে এটি তৈরির কাজ শুরু হয়। তাঁকে ঢাকা ত্যাগ করতে হয় বলে তিনি এটি শেষ করে যেতে পারেন নি। ফলে এটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি প্রবেশ পথ রয়েছে। দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথে গোপনে বের হওয়ার জন্য অনেকগুলো সুড়ঙ্গ পথ ছিল। এ দুর্গের ভেতরে 'দিওয়ান-ই-আম' নামক দরবার হল, তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ ও একটি পুকুর রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির মাজার।

লালবাগ দুর্গের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি। এর চারদিকেও ইটের তৈরি উঁচু প্রাচীর রয়েছে। এ দুর্গটির মাঝখানে খোলা জায়গা আছে। মুঘল শাসকগণ খোলা জায়গায় সুন্দর সুন্দর তাঁবুতে বাস করতেন। তবে মাঝখানে একটি দোতলা ছোট্ট সুরম্য প্রাসাদ ছিল। বর্তমানে সেখানে একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ ছিল। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে কুমারটুলিতে অবস্থিত। মুঘল আমলে বরিশালের জামালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়েতউল্লাহ এ প্রাসাদটি তৈরি করান। তাঁর পুত্র মতিউল্লাহর নিকট থেকে ফরাসিরা এটি ক্রয় করে

আহসান মঞ্জিল

ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত করেন। ঢাকার নবাব খাজা আলিমউল্লাহ ১৮৩০ সালে ফরাসিদের নিকট থেকে ক্রয় করে এটিকে আবার প্রাসাদে পরিণত করেন। নবাব আব্দুল গণি নিজ পুত্র

আহসানউল্লাহর নাম অনুসারে এটিকে 'আহসান মঞ্জিল' নামকরণ করেন। 'আহসান মঞ্জিল' বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন। এ প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দীর্ঘ বারান্দা আছে। প্রাসাদটিতে 'কুমুদ কলি' নামক সুন্দর একটি গম্বুজ রয়েছে। আহসান মঞ্জিলে 'জলসা ঘর', 'দরবার হল', 'রং মহল', বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। জমিদার ব্যবস্থা বিলুপ্তি ঘটলে আহসান মঞ্জিলের জৌলুস কমে আসে। এ প্রাসাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ধরে রাখার জন্য ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার এর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বর্তমানে আহসান মঞ্জিলকে যাদুঘরে পরিণত করা হয়েছে।

উপরে আলোচিত নিদর্শনগুলো ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আরও ছোটখাট অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। এসব নিদর্শন আমাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। আমরা এসব ঐতিহ্যে গৌরব বোধ করি। আমরা এসব ঐতিহাসিক স্থান ও নির্দশন দেখব। আমরা এগুলো সাধ্যমতো সংরক্ষণ করব।

আবার পড়ি

১. মহাস্থানগড় বাংলার খ্রিষ্টপূর্ব চার শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময় কালের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।
২. ওয়ারী-বটেশ্বর মহাস্থানগড়ের মতো বাংলার একটি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন।
৩. পাহাড়পুরে পাল বংশের রাজাদের আমলের প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে।
৪. ময়নামতিতে বিদ্যাচর্চার সুব্যবস্থা ছিল।
৫. মুসলিম শাসন আমলে বেশ কিছুকাল সোনারগাঁও বাংলার সুলতানদের রাজধানী ছিল।
৬. মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযমের শাসন আমলে লালবাগ দুর্গ তৈরি হয়।
৭. নবাব আব্দুল গণি নিজ পুত্র আহসানউল্লাহর নাম অনুসারে প্রাসাদটির 'আহসান মঞ্জিল' নামকরণ করেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলে পাওয়া বিভিন্ন নিদর্শনের তালিকা তৈরি করা।
২. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থানের ছবি সংগ্রহ করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ মহাস্থানগড়ে বাংলার কোন প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে?

ক. পানাম নগর　　খ. পুন্ড্রনগর

গ. পান্ডুয়া　　ঘ. ভাসুবিহার

১.২ ওয়ারী-বটেশ্বরের কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় কী পাওয়া গেছে?

ক. ছাপাঙ্কিত মুদ্রা　　খ. পোড়া মাটির ফলক

গ. ইস্পাতের ঢাল　　ঘ. পিতলের থালা-বাসন

১.৩ কোন রাজার শাসন আমলে 'সোমপুর মহাবিহার' নির্মিত হয় ?

ক. গোপাল　　খ. দেবপাল

গ. ধর্মপাল　　ঘ. মহীপাল

১.৪ কোথায় বাংলাদেশের লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?

ক. পাহাড়পুর　　খ. ময়নামতি

গ. ওয়ারী-বটেশ্বর　　ঘ. সোনারগাঁও

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শুন্যস্থান পূরণ কর।

ক. মহাস্থানগড়ে ———————— শিলালিপি পাওয়া গেছে।

খ. ময়নামতিতে ———————— সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

গ. লালবাগ দুর্গের চারদিকে ———————— তৈরি উঁচু প্রাচীর রয়েছে।

ঘ. আহসান মঞ্জিলে 'কুমুদ কলি' নামক সুন্দর একটি ————————রয়েছে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলা	মহাস্থানগড়
খ. খোদাই পাথর	ওয়ারী-বটেশ্বর
গ. পাথরের হাতিয়ার ও গুটিকা	ময়নামতি
ঘ. সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা	পাহাড়পুর
	লালবাগ দুর্গ

৫. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. মহাস্থানগড়ে কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের বর্ণনা দাও ?

খ. সোমপুর মহাবিহারে কী কী নিদর্শন পাওয়া গেছে ?

গ. ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকে কী কী দৃশ্য রয়েছে ?

ঘ. সোনারগাঁয়ে কোন আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে ?

ঙ. লালবাগ দুর্গের নিদর্শনগুলোর বর্ণনা দাও।

চ. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন কেন ?

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি: কৃষি ও শিল্প

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কৃষি, শিল্প, আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা এখন বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কে জানব।

বাংলাদেশের কৃষি

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। বেশিরভাগ মানুষ কৃষির সাথে যুক্ত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিখাত জনবহুল বাংলাদেশের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। তদুপরি এদেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে কৃষি পণ্য থেকে। বর্তমানে (২০১১–১২ অর্থবছরে) বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান প্রায় ২০%।

প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে কতগুলো হলো খাদ্য জাতীয় কৃষিদ্রব্য, আর কতগুলো হলো অর্থকরি কৃষিদ্রব্য। এখন আমরা খাদ্য জাতীয় ও অর্থকরী কৃষিদ্রব্য সম্পর্কে জানব।

খাদ্য জাতীয় কৃষিদ্রব্য

ধান, গম, ভূট্টা, আলু, তৈলবীজ, মসলা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খাদ্য জাতীয় ফসল বা কৃষিদ্রব্য। নিচে এগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হল।

ধান

ভাত বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। তাই ধান বাংলাদেশের প্রধান ফসল। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের জলবায়ু ধান চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক। এজন্য দেশের প্রায় সর্বত্র ধান উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ধরনের ধান চাষ হয়।

বাংলাদেশে দিনে দিনে ধান চাষের পদ্ধতি উন্নত হচ্ছে। ফলে বাৎসরিক ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত ধান থেকে প্রতিবছর প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ

ধানক্ষেত

মেট্রিক টন চাল পাওয়া যায়। আমাদের চালের চাহিদার বেশিরভাগ দেশের ধান থেকে মেটানো সম্ভব হয়।

গম

বাংলাদেশে গমের তৈরি খাদ্য ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ফলে গম চাষের প্রসার ঘটছে। শীতকালে গমের চাষ করা হয়। সাধারণত উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোতে গমের চাষ বেশি হয়।

গমক্ষেত

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। তবে দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিবছর প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন গম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

ডাল

ডাল বাংলাদেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিদ্রব্য। এদেশে বিভিন্ন প্রজাতির ডাল উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে ছোলা, মসুর, মটর, মুগ, মাসকলাই, খেসারি, অড়হর ইত্যাদি প্রধান। দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোতে ডাল চাষ বেশি হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৭/৮ লক্ষ মেট্রিক টন ডাল উৎপন্ন হয়। তবে দেশে প্রতিবছর ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন ডালের চাহিদা রয়েছে। ফলে বিপুল পরিমাণ ডাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

আলু

পৃথিবীর অনেক দেশে আলু প্রধান খাদ্য। বাংলাদেশেও আলু একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। এদেশের দোআঁশ এবং বেলে-দোআঁশ মাটি আলু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশে

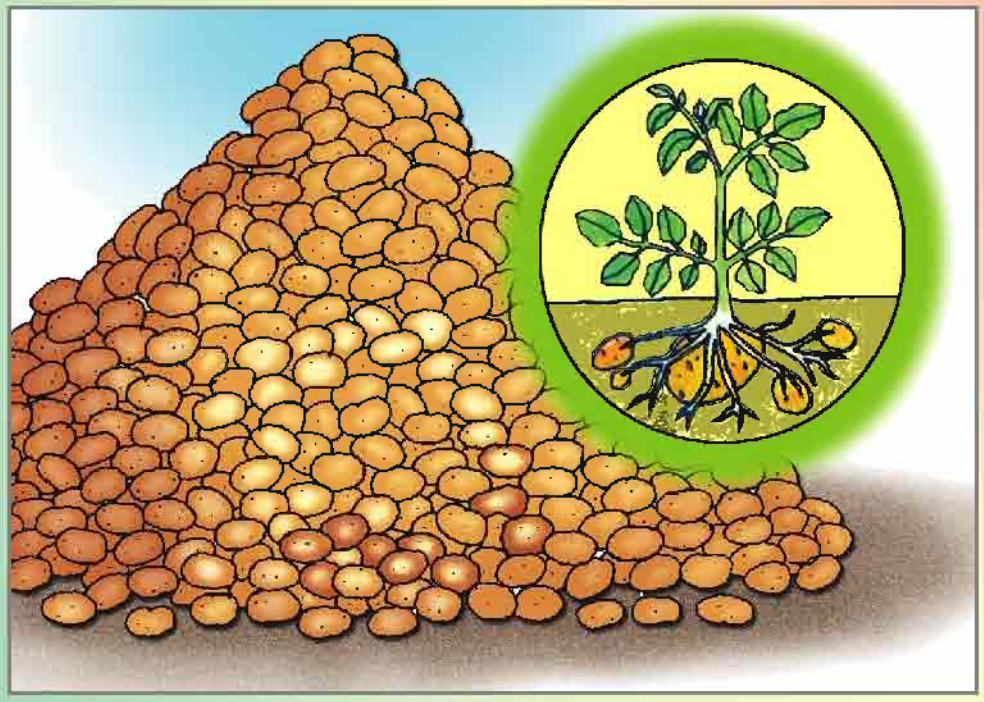

আলু

কয়েক ধরনের আলু চাষ হয়। তবে গোল আলু এবং মিষ্টি আলুর চাষ বেশি হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরনের আলু উৎপন্ন হয়।

তৈলবীজ

তৈল মানুষের খাদ্য চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলাদেশে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ খাবার তৈলের চাহিদা রয়েছে। এদেশে তৈলবীজ হিসেবে প্রধানত সরিষা, তিসি ও বাদাম

সরিষা ক্ষেত

চাষ করা হয়। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। এদেশে উৎপাদিত তৈলবীজ থেকে এ চাহিদার কিছুটা পূরণ হয় মাত্র। ফলে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাবার তৈল আমদানি করতে হয়।

মসলা

বাংলাদেশে কয়েক ধরনের মসলা উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব কৃষি দ্রব্য দেশে মসলার চাহিদা অনেকখানি পূরণ করে। তবে

মরিচ ক্ষেত

ঘাটতি মেটানোর জন্য প্রতিবছর বিদেশ থেকে কিছু পরিমাণ মসলা আমদানি করতে হয়।

অর্থকরি কৃষিদ্রব্য

বাংলাদেশে প্রধান অর্থকরি কৃষিদ্রব্যগুলো হচ্ছে– পাট, চা ও তামাক। এদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে এ তিনটি দ্রব্য থেকে।

পাট

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরি কৃষিদ্রব্য। পৃথিবীতে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এজন্য বাংলাদেশে পাটকে 'সোনালী আঁশ' বলা হয়। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এদেশের সব এলাকাতে পাটের চাষ হয়। তবে বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলায় বেশি পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক

পাট ক্ষেত

টন পাট উৎপন্ন হয়। এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ পাট চাষ ও ব্যবসার সাথে যুক্ত। ফলে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের বড় অংশ পাটের উপর নির্ভরশীল।

চা

পাটের মতো চা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের জলবায়ু চা চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোতে বেশি চা উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমানে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলাতেও চা চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশে

চা বাগান

অনেকগুলো চা বাগান রয়েছে। প্রতিবছর বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়। এদেশের চাহিদা পূরণ করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বাংলাদেশের চায়ের বিশেষ সুনাম রয়েছে। চা রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

তামাক

বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে তামাক চাষ হয়। তবে রংপুর, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মানিকগঞ্জ, বান্দরবান, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলায় বেশি তামাক উৎপন্ন হয়। এসব অঞ্চলে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন জাতের তামাক চাষ হয়। তামাক সাধারণত সিগারেট ও বিড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া তামাক দিয়ে জর্দা তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। তবে তামাক মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফলে এর চাষ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে তুলা, সুপারি, রেশম, রাবার ইত্যাদি অর্থকরি কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের কৃষকেরা কিছু ভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কাজও করে থাকেন। যেমন– আপেল বরই চাষ, স্ট্রবেরি চাষ, মাছ চাষ এবং হাঁস মুরগি পালন।

বাংলাদেশের শিল্প

প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে (২০১১–১২ অর্থবছরে) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান প্রায় ৩০%। বাংলাদেশের শিল্প ব্যবস্থা এখনও অনেকটা দুর্বল। তবে ক্রমে তা প্রসার লাভ করছে। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হচ্ছে– পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, ওষুধ শিল্প, সার শিল্প, কাগজ শিল্প এবং চামড়া শিল্প। এগুলো সম্পর্কে এখন আমরা জানব।

পাট শিল্প

বাংলাদেশে অনেকগুলো পাটের কারখানা রয়েছে। কারখানাগুলো প্রধানত নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, খুলনা, দৌলতপুরসহ নদী তীরবর্তী শহর অঞ্চলে অবস্থিত। এসব শিল্প-কারখানায় পাট দিয়ে নানা রকম পণ্য তৈরি হয়। এগুলোর মধ্যে চট, চটের তৈরি বস্তা ও নানা

পাটকল

রকম ব্যাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাট দিয়ে কার্পেট তৈরি হয়। বর্তমানে পাটের তৈরি সুতা দিয়ে বস্ত্র উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব পণ্য দেশের চাহিদা মেটায়। আবার বিদেশেও রপ্তানি হয়। তাতে বাংলাদেশ অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। দেশের পাট শিল্পে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিয়োজিত রয়েছে।

বস্ত্র শিল্প

পনেরো কোটি মানুষের বস্ত্র চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং আশেপাশের জেলাগুলোতে বেশি বস্ত্রকল রয়েছে। বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্প দেশের বস্ত্র চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে পারে না। এ জন্য বিদেশ থেকে বস্ত্র আমদানি করতে হয়।

পোশাক শিল্প

বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানায় পোশাক তৈরি হয়। এ পোশাকের বেশিরভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কয়েক লক্ষ নারী

গার্মেন্টস কারখানা

ও পুরুষ কাজ করে। পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

চিনি শিল্প

চিনিও বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বাংলাদেশে পনেরোটি সরকারি চিনিকল রয়েছে। এছাড়াও দুএকটি বেসরকারি চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব চিনিকলের মধ্যে ফরিদপুর চিনিকল, জয়পুরহাট চিনিকল, মোবারকগঞ্জ চিনিকল, নাটোর চিনিকল, রাজশাহী চিনিকল, রংপুর চিনিকল ও উত্তর-বাংলা চিনিকল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন হয়। কিন্তু দেশে প্রতিবছর প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন চিনির চাহিদা রয়েছে। ফলে বাংলাদেশকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ চিনি আমদানি করতে হয়।

সার শিল্প

বাংলাদেশের ফেঞ্চুগঞ্জ, ঘোড়াসাল, আশুগঞ্জ, চট্টগ্রাম, তারাকান্দি প্রভৃতি স্থানে সার কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় উৎপাদিত সার দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সার আমদানি করতে হয়।

কাগজ শিল্প

বাংলাদেশে কয়েকটি কাগজের কল রয়েছে। চন্দ্রঘোনা, খুলনা ও পাকশীতে রয়েছে সরকারি কাগজ কল। দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বেসরকারি কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব কলে উৎপাদিত কাগজ দেশের চাহিদার অনেকখানি পূরণ করে। কিছু পরিমাণ কাগজ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়।

সিমেন্ট শিল্প

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ছাতক সিমেন্ট কারখানা, শাহ সিমেন্ট কারখানা, মেঘনা সিমেন্ট কারখানা, আকিজ সিমেন্ট কারখানা, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট কারখানা, হোলসিম সিমেন্ট কারখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের কারখানাগুলোতে আমাদের চাহিদার অধিকাংশ সিমেন্ট উৎপাদিত হয়।

ওষুধ শিল্প

বাংলাদেশ ওষুধ শিল্পে অগ্রগতি লাভ করেছে। এদেশে উন্নতমানের ওষুধ তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের ওষুধ বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। এখানকার উল্লেখযোগ্য ওষুধ কারখানাগুলো হলো এসিআই, অপসোনিন, স্কয়ার ফার্মা, বেক্সিমকো ফার্মা ইত্যাদি ।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

বাংলাদেশে বেশ কয়েক ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। এগুলোর মধ্যে চামড়া শিল্প, সাবান শিল্প, বিড়ি শিল্প, তাঁত শিল্প, রেশম শিল্প, মৃৎ শিল্প, কাঁসা শিল্প, কাঠ শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সারাদেশে শতশত বছর ধরে এসব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে আসছে। এসব শিল্পের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চামড়া শিল্প

বাংলাদেশে চামড়া শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। এ শিল্পে পশুর চামড়া দিয়ে জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত চামড়াজাত পণ্য বিদেশেও রপ্তানি হয়।

সাবান শিল্প

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে সাবান ব্যবহার করা হয়। দেশে প্রতিদিন প্রচুর সাবানের চাহিদা রয়েছে। সাবান কারখানা এ চাহিদা পূরণ করে।

তামাক শিল্প

বাংলাদেশে তামাক কারখানাগুলোতে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ইত্যাদি তৈরি হয়। ধূমপান

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তা সত্ত্বেও অনেক মানুষ ধূমপান করে। দেশে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ সিগারেট ও বিড়ির চাহিদা রয়েছে। তামাক শিল্প এ চাহিদা পূরণ করে। বাংলাদেশের তামাকজাত পণ্য বিদেশেও রপ্তানি হয়।

তাঁত শিল্প

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্প। আমাদের দেশে তাঁতের চাহিদা প্রচুর। বাংলাদেশে শহর ও গ্রামে বহু তাঁত রয়েছে। এদেশের বস্ত্র চাহিদার একটি বড় অংশ তাঁতে বোনা কাপড়ে পূরণ হয়। তাঁতে বোনা কাপড়ের মধ্যে জামদানী, টাঙ্গাইল শাড়ি, মণিপুরি শাড়ি, উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও লুঙ্গি, গামছা, চাদর ইত্যাদিও তাঁতে উৎপাদিত হয়। বহুলোক এ শিল্পে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে।

তাঁত

রেশম শিল্প

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে রেশম গুটি চাষ হয়। এ রেশম গুটি থেকে রেশম সুতা পাওয়া যায়। রেশম সুতা দিয়ে শাড়ী ও কাপড় তৈরি হয়। এ শিল্প আমাদের জনপ্রিয় পোশাকের চাহিদা মেটায়।

কাঠ শিল্প

বাংলাদেশে প্রচুর কাঠের তৈরি জিনিস ব্যবহার করা হয়। এগুলোর মধ্যে পালং, খাট, চৌকি, সোফা, আলমারি, চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঠ দিয়ে বাড়িঘরও তৈরি করা হয়। এজন্য সারাদেশে কাঠ শিল্প গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ী বনাঞ্চলের কাঠ এ শিল্পে প্রধানত ব্যবহার করা হয়।

মৃৎ শিল্প

বাংলাদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সাথে মৃৎ শিল্প ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

মৃৎ শিল্প

আমাদের সমাজে এখনও নানাকাজে মাটির তৈরি জিনিস ব্যবহার করা হয়। যেমন– কলস, হাড়ি-পাতিল, টব, ফুলদানি, পুতুলসহ বিভিন্ন খেলনা ইত্যাদি। মৃৎ শিল্প এ চাহিদা পূরণ করে।

কাঁসা শিল্প

কাঁসার তৈরি জিনিস আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। কাঁসা শিল্প এই চাহিদা পূরণ করে। জামালপুর জেলার ইসলামপুর, টাঙ্গাইল জেলার কাগমারি ও ঢাকা জেলার ধামরাই কাঁসা শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

আমদানি ও রপ্তানি পণ্য

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমদানি ও রপ্তানির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিবছর বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ থেকে নানা ধরনের পণ্য আমদানি করে। আবার বিভিন্ন দেশে অনেক ধরনের পণ্য রপ্তানি করে।

আমদানি দ্রব্য

বাংলাদেশকে প্রতিবছর অনেক পণ্য আমদানি করতে হয়। প্রধান আমদানি পণ্যগুলো হচ্ছে– বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি, শিল্পের কাঁচামাল, খাদ্যপণ্য, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য।

রপ্তানি দ্রব্য

বাংলাদেশ প্রতিবছর বেশ কিছু দ্রব্য রপ্তানি করে। এগুলোর মধ্যে হিমায়িত খাদ্য, তৈরি পোশাক, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, চা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হয়। ফলে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীন অবস্থা বিরাজ করছে।

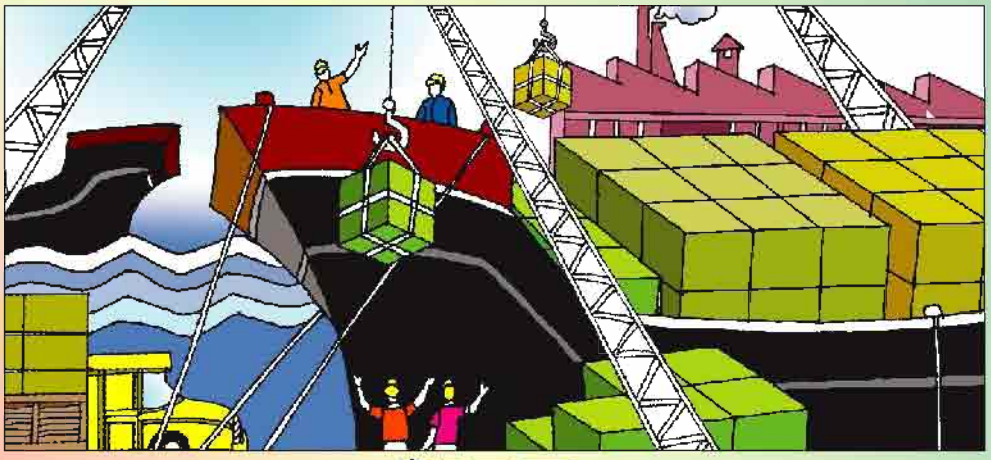

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্প উভয়ের অবদান রয়েছে। আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে কৃষি উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। শিল্প ব্যবস্থাকেও আরও শক্তিশালী করতে হবে। রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। আমদানির পরিমাণ দিনে দিনে কমাতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করবে। বিভিন্ন দ্রব্য ছাড়াও বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে যা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়।

আবার পড়ি

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা আশি ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।
২. ধান, গম, ভুট্টা, আলু, তৈলবীজ, মসলা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খাদ্য জাতীয় ফসল।
৩. পাট, চা ও তামাক বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী কৃষিদ্রব্য।
৪. বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হচ্ছে–পাট শিল্প, পোশাক শিল্প, চিনি শিল্প, ওষুধ শিল্প, সার শিল্প, কাগজ শিল্প ও চামড়া শিল্প।
৫. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৬. প্রতিবছর বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ থেকে নানা ধরনের পণ্য আমদানি করে। আবার বিভিন্ন দেশে অনেক ধরনের পণ্য রপ্তানি করে।

পরিকল্পিত কাজ

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষি দ্রব্য ও শিল্প পণ্যের তালিকা তৈরি করা।
২. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা তৈরি করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য জাতীয় ফসল কোনটি ?
ক. ধান খ. গম
গ. ভূট্টা ঘ. আলু

১.২ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পাট উৎপাদন হয় কোন দেশে ?
ক. ভারত খ. চীন
গ. বাংলাদেশ ঘ. নেপাল

১.৩ কোনটি রপ্তানি করে প্রতিবছর বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে ?
ক. চা খ. তামাক
গ. চিনি ঘ. পোশাক

১.৪ বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান শতকরা কত ভাগ ?
ক. ২০% খ. ২৫%
গ. ৩০% ঘ. ৩৫%

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. বাংলাদেশ একটি ———————— প্রধান দেশ।
খ. পৃথিবীর অনেক দেশে ———————— প্রধান খাদ্য।
গ. অর্থকরি কৃষিদ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ———————— অর্জন করে।
ঘ. বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে অর্থনৈতিক ———————— অবস্থা বিরাজ করছে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ	অর্থকরি কৃষিদ্রব্য
খ. বাংলাদেশে গমের তৈরি খাদ্য	তাঁত, রেশম, কাঁসা ও মৃৎ।
গ. পাট, চা ও তামাক	খাদ্য পণ্য, তৈরি পোশাক, শিল্পের কাঁচামাল
ঘ. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	জনপ্রিয়তা লাভ করছে
	কৃষির সাথে যুক্ত

৫. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যের নাম লিখ।

খ. বাংলাদেশের প্রধান দুটি অর্থকরি কৃষিদ্রব্যের বর্ণনা দাও।

গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান উল্লেখ কর।

ঘ. বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঙ. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব লিখ।

চ. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের নাম লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

চতুর্থ শ্রেণিতে আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদার উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব। এছাড়াও জনসম্পদ বলতে কী বুঝি এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে কিভাবে জনসম্পদে রূপান্তর করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে জানব।

মৌলিক চাহিদার ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

আমরা জানি যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানুষের মৌলিক চাহিদা। অতিরিক্ত জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ করা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর এর প্রভাব পড়ে দেশের সমগ্র জনগণের উপর।

খাদ্যের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতির একটি প্রধান কারণ। তাই কৃষি প্রধান দেশ হয়েও বাংলাদেশে খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। এখানে জমির তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি। তাই অতিরিক্ত মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটাতে আমাদের প্রতি বছর বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার বসতি স্থাপনের জন্য কৃষি জমির পরিমাণও কমে যাচ্ছে। খাদ্যের অভাব হলে শিশুসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠী পুষ্টিহীনতায় ভোগে। খাদ্যের পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানির রয়েছে তীব্র সংকট। খাদ্য ও পানীয় জলের সংকট দেশের ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বস্ত্রের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র। কিন্তু পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি হলে অনেক মা-বাবা সবসময় সন্তানদের প্রয়োজনীয় কাপড় কিনে দিতে পারেন না। উপযুক্ত পোশাক না থাকার কারণে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে আসতে চায় না।

বাসস্থানের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

জাতিসংঘের তথ্যমতে বাংলাদেশে প্রায় দশ লাখ মানুষ গৃহহীন। বর্তমানে যে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে প্রতিবছর প্রায় তিন লাখ মানুষের জন্য অতিরিক্ত বাসস্থান প্রয়োজন। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত জনগোষ্ঠীর বাসস্থান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। নিচের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে শহরে ছিন্নমূল মানুষেরা মানবেতর অবস্থায় বসবাস করছে।

শহরে ছিন্নমূল মানুষ

শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব

একটি দেশের অন্যতম সম্পদ হচ্ছে সে দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। কিন্তু বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি অক্ষরজ্ঞান নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে সফলতা আসা সত্ত্বেও শিক্ষার হার বাড়ছে না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে সম্পদের তুলনায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এ কারণে শিক্ষাখাতে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া

যাচ্ছে না। আবার অনেক দরিদ্র মা-বাবা তাদের সব সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না। এর ফলে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না বা লেখাপড়া শেষ না করে ঝরে পড়ে।

স্বাস্থ্যের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার পুষ্টির চাহিদা মেটানো বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। তাছাড়া সবার জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। প্রতি ৪০৪৩ জনের জন্য মাত্র ১ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক রয়েছেন। হাসপাতাল বা কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতেও চাহিদার তুলনায় রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে অনেকেই উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জীবনযাত্রার মানের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি সবকিছু মিলেই নির্ধারিত হয় দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান। এ প্রসঙ্গে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে দেশে দারিদ্র্য বিমোচন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, বেকারত্ব বাড়ছে ও মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

বিভিন্ন যানবাহনে অতিরিক্ত জনসংখ্যা

প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থাও করা যায় না। দেশে সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে যাওয়া ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত

হওয়ার পেছনেও অতিরিক্ত জনসংখ্যা অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের নারী উন্নয়নের জন্যও বাধা। কারণ নারী উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষার প্রসার দরকার। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি দরকার। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়োজন। আর দরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ। কিন্তু তাদের সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনে অধিক সম্পদ ব্যয় করতে হয় বলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবেশ সমস্যা একটি প্রধান আলোচিত বিষয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে অধিক ফসল ফলাতে প্রচুর রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো পুকুর ও নদীর পানি নষ্ট করছে। আবার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার জনগণ নানাভাবে পরিবেশ দূষণ করছে।

বন কেটে ঘরবাড়ি তৈরি

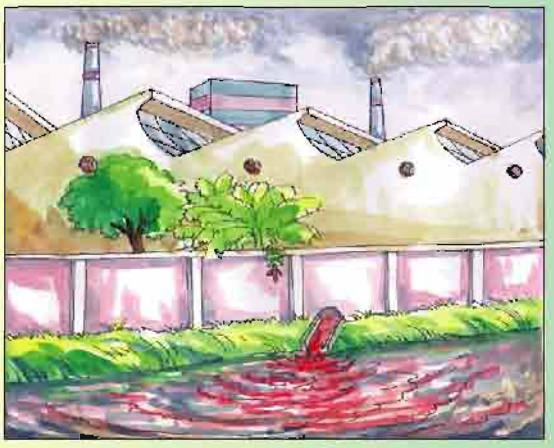

কলকারখানার মাধ্যমে পানি ও বায়ু দূষণ

বনের গাছপালা কেটে বাড়িঘর তৈরি করছে বা জীবিকা নির্বাহ করছে। ভূ-গর্ভের পানির অতিরিক্ত উত্তোলন হচ্ছে বর্ধিত জনগণের চাহিদা মেটাতে। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে চিরচেনা পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। ফলে দেশ মারাত্মক সংকটের দিকে যাচ্ছে।

জনসম্পদ

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি উপাদানের মধ্যে দুটি হচ্ছে জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। তৃতীয়টি হচ্ছে মূলধন। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন জনসম্পদ। জনসম্পদ হচ্ছে কোন দেশের শ্রমশক্তি। বাংলাদেশে

মূলধন কম হলেও প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদে সমৃদ্ধ। তবে এদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায়

বাংলাদেশে যথেষ্ট মূলধন না থাকলেও আছে পর্যাপ্ত জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যার দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে তাদের 'মানব মূলধন' বা দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। কারণ মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নির্ভর করে দক্ষ জনসম্পদের উপর। তাই দক্ষ জনসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ও অপরিহার্য শর্ত। বাংলাদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে যদি দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করা যায় তবে জনসংখ্যা দেশের জন্য সমস্যা না হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। দক্ষ জনসম্পদ গঠনের কয়েকটি উপায় এখানে আলোচনা করা হলো :

শিক্ষা: মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল উপাদান হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসম্পদকে দক্ষ করে তোলা যায়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে জনসম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রতি সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন।

মানুষ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে

দক্ষতা বৃদ্ধি: শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষমতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি।

জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান

অতিরিক্ত জনসংখ্যার দক্ষতা বাড়াতে গেলে অনেক সময় সম্পদেরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু জনসংখ্যা কম হলে সীমিত সম্পদ দিয়েও তাদেরকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব হয়।

জনসংখ্যা কম হলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মানও বজায় রাখা যায়। তবে বর্তমান জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করার জন্যও প্রয়োজন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আর তা করতে পারলে এই জনসংখ্যা দক্ষ জনসম্পদে পরিণত হবে।

জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি

উপযুক্ত বাসস্থান, পরিবেশ ও মানসম্মত জীবন-যাপন, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সু-স্বাস্থ্যের মূল উপাদান। উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি, পরিবেশসম্মত আবাসন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তর করা যায়।

জনশক্তি পরিকল্পনা

বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এই লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যেতে হবে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি

বাংলাদেশে বেকার সমস্যা যেমন প্রকট তেমনি দক্ষ শ্রমিকেরও অভাব রয়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা ও শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এই দুটি বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিলে বাংলাদেশের জনসম্পদ উন্নত হবে ও বেকার সমস্যার সমাধান হবে।

মানব সম্পদ রপ্তানি

আমাদের শ্রমশক্তির দক্ষতা বাড়াতে পারলে এই বিশাল জনগোষ্ঠী জনসম্পদে রূপান্তরিত হবে। কারণ পৃথিবীর বহুদেশে মূলধন বা প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও জনসম্পদের অভাব থাকায় দক্ষ জনসম্পদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এসব দেশে বাংলাদেশের দক্ষ জনসম্পদ রপ্তানি করতে পারলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। বর্তমানে যারা বিদেশে যাচ্ছেন তারা অনেকসময় অদক্ষতার কারণে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারেন না। আবার অনেককে প্রতারিত হয়ে দেশে ফিরে আসতে হয়। প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে বিদেশে গেলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যাবে এবং দেশের অবস্থাও ভালো হবে।
এগুলো ছাড়া আরও অনেক উপায়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়।

আবার পড়ি

১. দেশের জনসংখ্যা বেশি হলে মৌলিক চাহিদা ঠিকমতো পূরণ করা যায় না।
২. বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করার সুযোগ আছে।

৩. অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

৪. দক্ষ জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার সুযোগ আছে।

পরিকল্পিত কাজ

১. পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মৌলিক চাহিদা ও জীবনযাত্রার মানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব চিহ্নিত ও বর্ণনা করা।

২. ছবি, চিত্র, চার্ট ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেয়া।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ নিচের কোনটি জীবনযাত্রার মান নির্ধারক নয় ?

ক. খাদ্য খ. বস্ত্র

গ. মর্যাদা ঘ. চিকিৎসা

১.২ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান কয়টি ?

ক. এক খ. দুই

গ. তিন ঘ. চার

১.৩ কোনটি জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করার অন্যতম উপায় নয় ?

ক. শিক্ষা খ. প্রশিক্ষণ

গ. চিত্তবিনোদন ঘ. মানবসম্পদ রপ্তানি

১.৪ বাংলাদেশে প্রতিবছর কী পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি হয় ?

ক. প্রায় ২৫ লক্ষ টন খ. প্রায় ২৪ লক্ষ টন

গ. প্রায় ২৬ লক্ষ টন ঘ. প্রায় ২০ লক্ষ টন

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. জমির তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা ——————।

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের উপর —————— প্রভাব পড়ে।

গ. বাংলাদেশে প্রতি ———— জন মানুষের জন্য ১ জন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক রয়েছেন।

ঘ. জনসম্পদ হচ্ছে কোন দেশের ———————— ।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. শিক্ষার ক্ষেত্রে সফলতা আসা সত্ত্বেও	জনগণের জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হয়
খ. জনসম্পদের দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে	পুরুষ
গ. বাংলাদেশে পরিবেশ সমস্যা	একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়
ঘ. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা মিলিয়ে দেশের	শিক্ষার হার বাড়ছে না
	'মানব মূলধন' তৈরি করা যায়

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো কী ?

খ. খাদ্যের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব লিখ।

গ. অতিরিক্ত জনসংখ্যা থাকলে শিক্ষার কী সমস্যা হয় ?

ঘ. জনসম্পদ কাকে বলে ?

ঙ. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের পাঁচটি উপায় লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জলবায়ু এবং দুর্যোগ

জলবায়ু এবং দুর্যোগ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে নানা ধরনের দুর্যোগ ঘটে। বিশ্বে আবহাওয়া ও জলবায়ু নানা কারণে বদলে যাচ্ছে। যার জন্যে বিভিন্ন দুর্যোগ হচ্ছে বা বেড়ে যাচ্ছে। এই অধ্যায়ে আমরা আবহাওয়া, জলবায়ু ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানব।

আবহাওয়া ও জলবায়ু

কোন স্থানের স্বল্প সময়ের অর্থাৎ ১ থেকে ৭ দিনের বায়ু, তাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির গড় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। সাধারণত ৩০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড়কেই জলবায়ু বলা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

বিভিন্ন কারণে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন– কলকারখানা, যানবাহনের ধোঁয়া, বন-জঙ্গলের পরিমাণ কমে যাওয়া, নদী ধ্বংস হওয়া, জলাধার ভরাট করা ইত্যাদি কারণে প্রকৃতির ক্ষতি হয়। বিশ্বে তাপমাত্রা বেড়ে বরফ গলে যায়, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যায়। মানুষের নানা প্রকার কর্মকাণ্ডে এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হয়।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে নানা রকম প্রভাব দেখা যাচ্ছে। যেমন–

- গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে।
- ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।
- বারবার ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে।
- মাটির লবণাক্ততা বেড়ে কৃষিজমির ক্ষতি করছে।
- গাছপালা ও প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ ধরনের আরও বহু প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ নানা দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে।

দুর্যোগ

দুর্যোগ হচ্ছে একটি মারাত্মক পরিস্থিতি। দুর্যোগ মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, সম্পদ ও পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে। এ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হয় যে একটি দেশের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে তা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর দুর্যোগের প্রভাব

আমরা আগেই জেনেছি যে, প্রাকৃতিক ও মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশে পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটছে। পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে যেমন– বন ধ্বংস হচ্ছে, কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, পানি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে। আর তাই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আমাদের বিশেষ প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন।

ধারণা করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে। এতে খাদ্য, কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদন কমে যাবে। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও কোটি কোটি মানুষ গৃহহীন হবে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন– আইলা, সিডরের মত ঘূর্ণিঝড় ঘন ঘন আঘাত হানছে। মানুষ ঘরবাড়ি হারাচ্ছে। নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে মানুষের দারিদ্র্য, জনসংখ্যার ঘনত্বের মতো সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে মানুষ, পশুপাখি, মাছসহ অন্যান্য প্রাণী, ফসল, ঘরবাড়ি, গাছপালা, রাস্তাঘাট সবকিছুরই ক্ষতি হয়। এসব দুর্যোগের সময় মানুষ আশ্রয়, পানি, খাদ্য, চিকিৎসা, কর্মসংস্থানের অভাবসহ বিভিন্ন সংকটে পড়ে। শিশুরাও বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। ফলে তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। অনেক সময় বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িঘরে পানি উঠে যায়। তখন অনেকেরই ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে হয়। কখনো কখনো উঁচু রাস্তা বা বাঁধের উপরে মাচা বানিয়ে অনেক পরিবার বসবাস করে। সেখানে খাদ্যাভাব, বিশুদ্ধ পানির অভাবের কারণে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর মধ্যে পানিবাহিত রোগই বেশি হয় যেমন– ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগ ইত্যাদি। দুর্যোগের ফলে অনেক মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম থেকে শহরে ভাসমান জনগোষ্ঠী হিসেবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকা

বাংলাদেশের প্রধান দুর্যোগগুলোর মধ্যে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও আগুনলাগা সম্পর্কে আমরা চতুর্থ শ্রেণিতে জেনেছি। এবার আরও কয়েকটি দুর্যোগ যেমন– নদীভাঙ্গন, খরা, ও ভূমিকম্প সম্পর্কে জানব। বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ এলাকায়ই বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ঘটে। এর মধ্যে দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, চর, হাওর ও নদী তীরবর্তী অঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নদী ভাঙন

বাংলাদেশে অসংখ্য নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। বিভিন্ন কারণে নদীগুলোর পাড় ভেঙে যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে প্রধান হলো জোয়ার-ভাটা, ভূমিকম্প ইত্যাদি। অন্যদিকে মানবসৃষ্ট কারণের মধ্যে রয়েছে অপরিকল্পিত নদী খনন, বালু উত্তোলন, নদী তীরবর্তী গাছপালা কাটা ইত্যাদি। বন্যা প্রাকৃতিক নিয়মে হলেও মানুষের কর্মকান্ড এর তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। মারাত্মক বন্যা নদী ভাঙনের অন্যতম কারণ। বন্যার সময় নদী ভাঙন মারাত্মক রূপ ধারণ করে। এর ফলে কৃষিজমি, ঘরবাড়ি, জনবসতি এমনকি পুরো গ্রাম নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

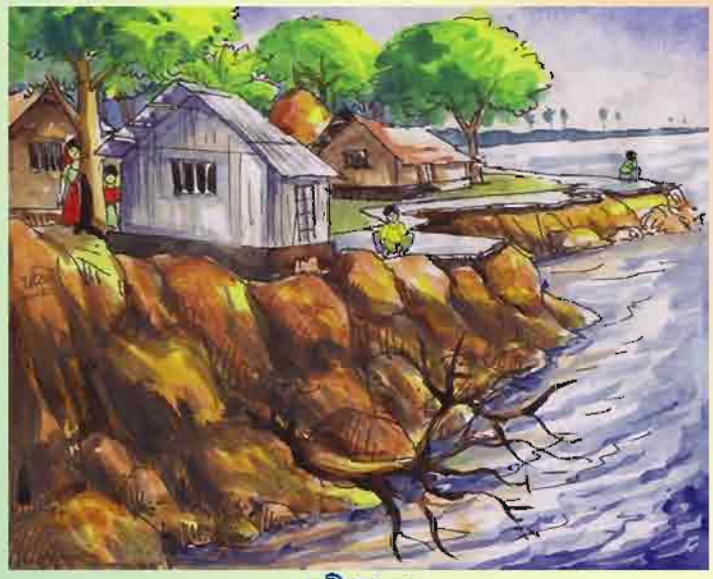

নদী ভাঙন

সরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমি নদী ভাঙনের শিকার হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়। সামাজিক জীবন ব্যাহত হয়। শিশুদের শিক্ষাজীবনের ক্ষতি হয়।

খরা

দীর্ঘকাল ধরে শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে খরা হয়। বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, গাছপালা কেটে ফেলা ও বায়ু দূষণ ইত্যাদি বায়ু মন্ডলকে শুষ্ক করে ফেলে। এসব কারণে বৃষ্টিপাতও কমে যায়। এগুলো মিলিতভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে খরার প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

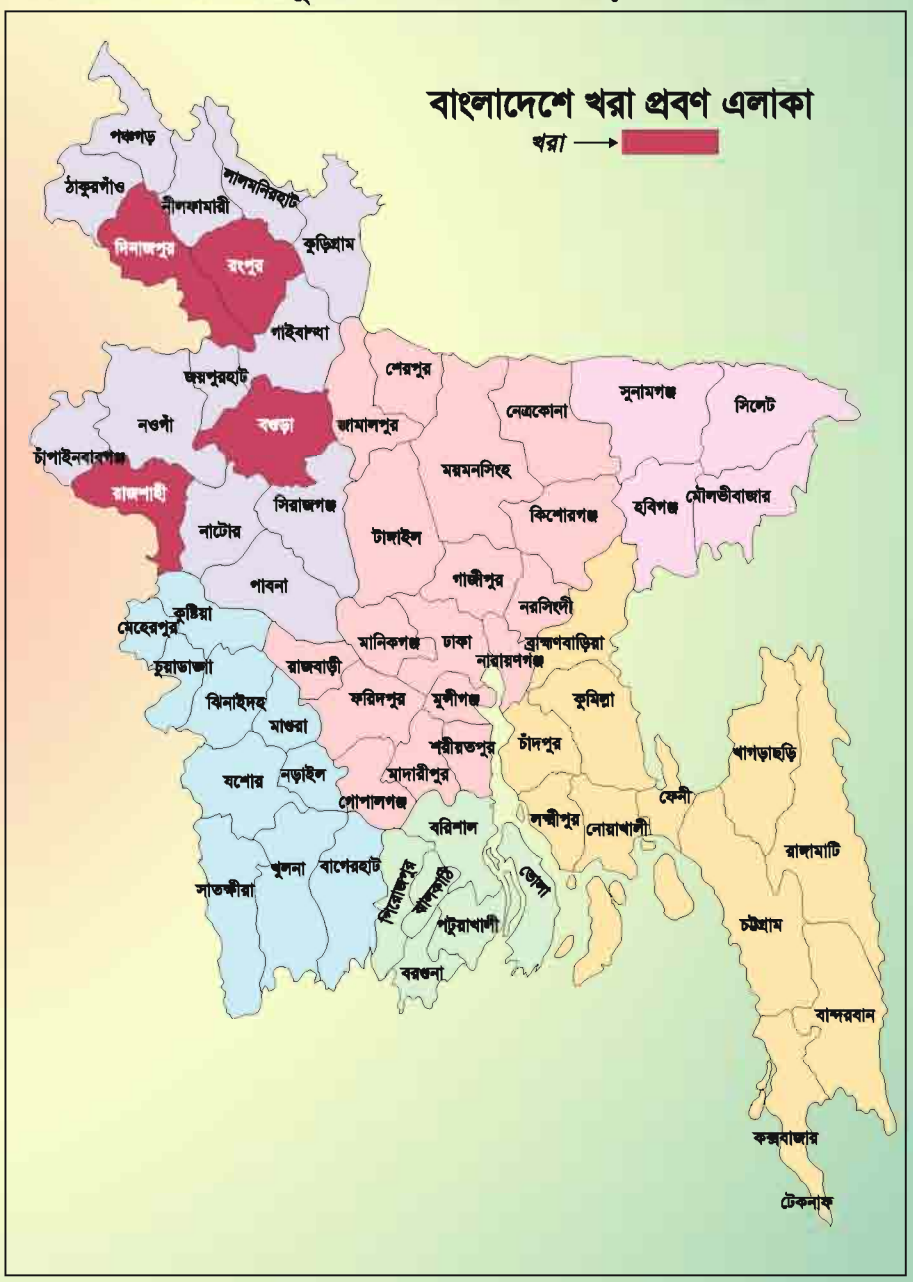

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরাপীড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে উঠে। কুয়া, খাল, বিল শুকিয়ে যায়। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কমে যায়। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যায় আর মাটির আর্দ্রতা কমে যায়। মাঠের ফসল ফলাতে কষ্ট হয়। গবাদি পশুর খাদ্য সংকট দেখা দেয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ খাবার পানি, চাষাবাদ, পশুপালনের জন্য সরাসরি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। তাই খরা তাদের জন্য একটি মারাত্মক দুর্যোগ। অত্যধিক গরমে শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না বা ঠিকমতো পড়ালেখা করতে পারে না। অনেকে জ্বর, ডায়রিয়া, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়সহ নানা অসুখে ভোগে। হাঁস, মুরগির মড়ক দেখা দেয়। খরার সময় তেমন কাজ থাকে না। তাই অনেকের আয় বন্ধ হয়ে যায়।

খরাপীড়িত অঞ্চল

খরাপীড়িত অঞ্চলের মানুষ

ভূমিকম্প

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে প্রায়ই মৃদু ও মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। বড় ভূমিকম্প হলে অনেক ক্ষতি হবে। ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। ভূমিকম্প সহ্য করতে পারে এভাবে বাড়িঘর তৈরি করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এভাবে ভূমিকম্পের ক্ষতি কমানো সম্ভব।

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত একটি এলাকা

ভূমিকম্পের সময় আমাদের করণীয়গুলো নিচে পড়ি–

- পুরোপুরি শান্ত থাকতে হবে।
- আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি করা যাবে না।
- বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে দিতে হবে।
- কাঠের টেবিল বা শক্ত কোন আসবাপত্রের নিচে আশ্রয় নিতে হবে।
- বারান্দা, আলমারি, জানালা, বা ঝোলানো ছবি থেকে দূরে থাকতে হবে।
- পাকা দালানে থাকলে বিম এর পাশে দাঁড়াতে হবে।
- প্রথম ভূকম্পন থেমে যাবার পর সারিবদ্ধভাবে ঘর থেকে বের হয়ে খালি জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে।
- প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বাড়িতেই রাখতে হবে।
- বন্ধু, সহপাঠী, সমবয়সী, শিক্ষক ও অভিভাবক সবার সাথে ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও করণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে।।

দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি

এসব দুর্যোগ ছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে কালবৈশাখী, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্য প্রবাহ, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি প্রভৃতি দুর্যোগ হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই দুর্যোগ গুলোর প্রবণতাও বেড়ে যাচ্ছে ও সম্পদের ক্ষতি করছে। তাই প্রতিটি দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা নিজেদের প্রস্তুত রাখব। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, জলবায়ুর পরিবর্তন হয় এবং দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমন কোন কাজ করব না।

দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি

টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্যোগের পূর্বাভাস জানতে পারলে তা সাথে সাথে এলাকায় মাইকযোগে প্রচার করে মানুষকে সতর্ক করব।

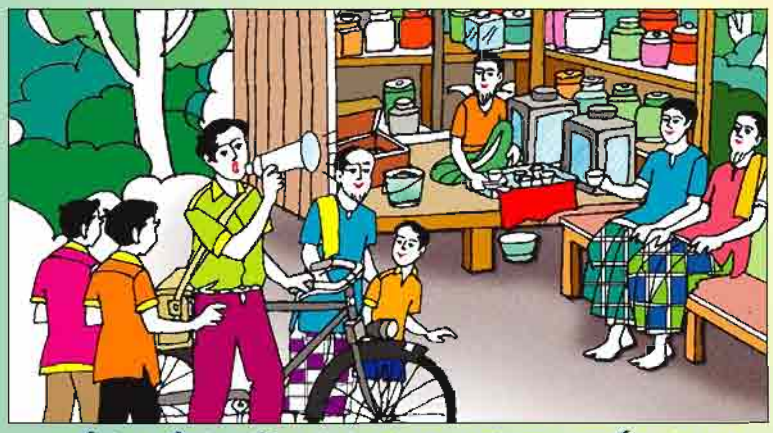

দুর্যোগের পূর্বাভাস মাইকযোগে প্রচার করে মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে

আবার পড়ি

১. প্রাকৃতিক ও সামাজিক নানা কারণে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে।
২. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন দুর্যোগের সৃষ্টি হচ্ছে।
৩. এসকল দুর্যোগের কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।
৪. প্রতিটি দুর্যোগ সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জানার চেষ্টা করব ও মোকাবেলায় নিজেদের প্রস্তুত রাখব।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিজ এলাকায় সংঘটিত যেকোন একটি দুর্যোগের উপর সংক্ষিপ্ত (সর্বোচ্চ এক পাতা) প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।
২. শিক্ষার্থীরা দুর্যোগের ওপর বিভিন্ন তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে।
৩. শিক্ষার্থীরা দুর্যোগ মোকাবেলার দক্ষতা অর্জনের মহড়া দিবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ কত সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠে তলিয়ে যেতে পারে?

ক. ২০২০ খ. ২০৩০
গ. ২০৪০ ঘ. ২০৫০

১.২ শুষ্ক ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে কী হয় ?

ক. বন্যা খ. খরা
গ. নদীভাঙন ঘ. ভূমিকম্প

১.৩ প্রতি বছর কত হেক্টর জমি নদী ভাঙনের শিকার হয় ?

ক. ৭০০০ খ. ৮০০০
গ. ৯০০০ ঘ. ১০০০০

১.৪ কিসের অভাবে খরা হয়?

ক. বাতাস খ. পানি
গ. গবাদিপশু ঘ. ফসল

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. মাটির লবণাক্ততা বেড়ে কৃষি জমির ———————— করছে।

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের প্রবণতা ————————।

গ. খরার সময় অনেকের ———————— বন্ধ হয়ে যায় ।

ঘ. ভূমিকম্পের সময় পুরোপুরি ———————— থাকতে হবে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ	বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস
খ. বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের জেলাগুলোতে	খরার প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে
গ. বাড়ির আশেপাশে	জলবায়ু পরিবর্তন হয়
ঘ. ছোট ছোট ভূমিকম্প	গাছপালা লাগাব
	পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. আবহাওয়া ও জলবায়ু কাকে বলে ?

খ. জলবায়ু পরিবর্তনে কী কী ক্ষতি হয় ?

গ. খরার কারণে কী কী সমস্যা হয় ?

ঘ. বিভিন্ন দুর্যোগে শিশুদের লেখাপড়ার কী কী সমস্যা হয় ?

ঙ. ভূমিকম্প মোকাবেলায় কোন কোন বিষয় মনে রাখতে হবে ?

সপ্তম অধ্যায়
মানবাধিকার

মানবাধিকার

আমরা মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের সবার সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এজন্য আমাদের কিছু সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন হয়। যেমন– আমরা লেখাপড়া করি। স্বাধীনভাবে চলাচল করি। মত প্রকাশ করি। সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করি। বিপদে পড়লে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত লোকজন আমাদের বিপদ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। সমাজের সদস্য হিসেবে এরকম আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা আমাদের প্রয়োজন। মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় এসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারগুলোকে বলা হয় 'মানবাধিকার'। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানুষের এসব অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুমোদন করেছে 'মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র'। এ ঘোষণাপত্র অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থা ভেদে বিশ্বের সব দেশের সব মানুষের এগুলো পাওয়ার অধিকার আছে।

মানুষ হিসেবে আমাদের অধিকার

নিচের ছকে কয়েকটি মৌলিক মানবাধিকার জেনে নিই।

○ সব মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন	○ আইনের চোখে সব মানুষ সমান
○ স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করার অধিকার	○ সবার সমান মজুরি পাওয়ার অধিকার
○ সমাজে সবার সমান মর্যাদা ও অধিকার	○ বিচার পাওয়ার অধিকার
○ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার	○ সম্পত্তির অধিকার
○ প্রত্যেকের নিরাপত্তা লাভের অধিকার	○ নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার
○ কাউকে নির্যাতন ও অত্যাচার না করা	○ নিজের চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার
○ খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার ও আটক না করা	○ নারী-পুরুষের সমান অধিকার

আমাদের দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার এ অধিকারগুলো রয়েছে।

মানবাধিকারের গুরুত্ব

মানবাধিকারগুলো মানুষের জীবনকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। লেখাপড়া শিখে যোগ্যতা ও মর্যাদার সাথে সমাজে বসবাসের সুযোগ করে দেয়। মানুষের ভালো গুণগুলোকে বিকশিত হতে সাহায্য করে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি তৈরি করে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। স্বাধীন এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাই মানবাধিকারের বিকল্প নেই।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমরা মানবাধিকারগুলো পেয়ে থাকি। আমাদের সবার দায়িত্ব হলো মানবাধিকারগুলো বাস্তবায়ন করা। জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা তাই মানবাধিকারগুলো আদায়ে চেষ্টা করব। অন্যের অধিকার যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়েও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কারো অধিকার নষ্ট হতে পারে এরকম কাজ আমাদের কখনোই করা উচিত নয়।

মানবাধিকার বিরোধী কয়েকটি কাজ

আমরা জেনেছি মানবাধিকারগুলো আমাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্য সবার মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করা উচিত। ভালো করে ভেবে দেখি – এগুলো আমরা মেনে চলি কি না ?

আমাদের সমাজে প্রায়ই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা শোনা যায়। অনেক সময় না জানার কারণেও আমরা মানবাধিকার বিরোধী কাজ করি। নিচে আমাদের সমাজে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি উদাহরণ পড়ি।

আমাদের দেশে অনেকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে শিশুরা। অনেক শিশু দারিদ্র্যের কারণে কাজ করতে বাধ্য হয়। গ্রামে শিশুরা ক্ষেতে, ইটের ভাঁটায় কাজ করে। শহরের শিশুরা বাসা-বাড়িতে, দোকানে, কলকারখানায় কাজ করে। অনেকে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। শিশু শ্রমিকেরা সাধারণত লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। শুধু শিশু নয়, বড়দের মধ্যেও অনেকে

একটি শিশু ইটের বোঝা মাথায় নিয়ে যাচ্ছে

শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ শিক্ষার অধিকার একটি প্রধান মানবাধিকার। সকলকে তাই শিক্ষার সুযোগ দেয়া উচিত।

অনেক সময় আমরা সামান্য কারণে বা বিনা কারণে শিশু বা অন্যদের শারীরিক নির্যাতন করি। বাড়িতে কাজে সহায়তাকারী ব্যক্তিরা কখনো কখনো এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়। অনেক সময় তাদের বাড়ির অন্যদের সমান খাবার, পোশাক, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও দেয়া হয় না। এতে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। মানুষের প্রতি এ ধরনের অন্যায় আচরণ করা উচিত নয়।

কাজে সহায়তাকারী মেয়েকে নির্যাতন করা হচ্ছে

নারী ও শিশুদের পাচার করা হচ্ছে

আমাদের দেশ থেকে প্রায়ই নারী ও শিশুদের বিদেশে পাচার করা হয়। সেখানে তাদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও অমানবিক কাজে ব্যবহার করা হয়। এসব কাজ করতে যেয়ে অনেকে আহত হয়। কেউবা মারা যায়। তাদের পরিবারের সদস্যরাও এতে অনেক কষ্ট পায়। শিশু ও নারী পাচার মানবাধিকার বিরোধী কাজ। এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটতে দেখলে তা অবশ্যই পুলিশ এবং অন্যদের জানানো উচিত।

মানবাধিকার অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ সবার সমান অধিকার আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা দেয়া হয় না। আমাদের সমাজে শিক্ষা, খাদ্য, মজুরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করা হয়। সামাজিক ও শারীরিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিরাও এ ধরনের

পুরুষকে অধিক ও নারীকে কম মজুরি দেওয়া হচ্ছে

বৈষম্যের শিকার হয়। আমাদের দায়িত্ব সকলকে সমান অধিকার দেওয়া। কোনভাবেই মানুষে মানুষে বৈষম্য করা উচিত নয়।

ঘটনাগুলোর মতো আরও অনেক মানবাধিকার বিরোধী কাজ আমাদের সমাজে ঘটে থাকে। পত্র-পত্রিকার পাতায় ও রেডিও-টেলিভিশনের খবরে আমরা প্রায়ই এ ধরনের অনেক ঘটনা জানতে পারি । এ ধরনের কাজ করা উচিত নয়। সবার মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে।

সকলের মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের কী করা উচিত তা নিচের ছকে লিখি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি ঘৃণ্য কাজ। পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণ ও সমান উন্নয়নের জন্য আমাদের অবশ্যই সবার অধিকারকে শ্রদ্ধা করতে হবে। আমরা যদি প্রত্যেকেই এগুলো মেনে চলার অভ্যাস করি তাহলে আমাদের সমাজটা অনেক সুন্দর হবে। এজন্য আমরা সবার মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করব। বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ যদি মানবাধিকার বিরোধী কোনো কাজ করে তবে তাকে এ বিষয়ে সচেতন করব। প্রয়োজন হলে প্রতিবাদ করব। সরকার কর্তৃক এ লক্ষ্যে করা বিভিন্ন আইন মেনে চলব। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করব। নাগরিক হিসেবে এটি আমাদের দায়িত্ব।

লোকজন ফেস্টুন হাতে মানবাধিকার রক্ষায় স্লোগান দিচ্ছে

আবার পড়ি

১. মানুষ হিসেবে ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকারগুলোকে বলা হয় মানবাধিকার। মানুষের সুস্থ, সুন্দর বিকাশের জন্য এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন।
২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে এ অধিকারগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য।
৩. সমাজের সবার মানবাধিকারকে আমরা শ্রদ্ধা করব এবং এগুলো রক্ষায় সচেতন থাকব।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে কয়েকটি অঙ্গীকার চিহ্নিত করা এবং এ অধ্যায়ের পাঠ শেষে শিশুদের দিয়ে অঙ্গীকারগুলো পালনে শপথ করানো। শিশুরা অঙ্গীকারগুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণির দেয়ালে টাঙিয়ে দিবে।
২. মানবাধিকার বাস্তবায়নের উপর দলীয় অভিনয়ের মাধ্যমে ইতিবাচক মনোভাব বিকাশের চর্চা করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ মানবাধিকার কী ?

ক. নিম্নবিত্তদের অধিকার　　খ. মানুষ হিসেবে অধিকার
গ. শিশুদের অধিকার　　ঘ. ধনীদের অধিকার

১.২ জাতিসংঘ কোন সালে 'মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র' অনুমোদন করেছে ?

ক. ১৯৪০　　খ. ১৯৪৫
গ. ১৯৪৮　　ঘ. ১৯৫০

১.৩ কোনটি মানবাধিকারের উদাহরণ ?

ক. নির্যাতন করা　　খ. আটক রাখা
গ. শিশু পাচার　　ঘ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

১.৪ কোনটি মানবাধিকারের লঙ্ঘন ?

ক. নিরাপত্তা প্রদান　　খ. ধর্ম পালনের সুযোগ
গ. সবার সমান অধিকার　　ঘ. শিক্ষার সুযোগ না দেওয়া

১.৫ মানবাধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার ?

ক. পরিবার ও রাষ্ট্র　　খ. পারিবার ও সমাজ

গ. রাষ্ট্র ও সমাজ　　ঘ. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. মানুষ হিসেবে সবার ———————— বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

খ. মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় অধিকারগুলোকে বলে ———— ।

গ. সব মানুষের নিজ নিজ ———————— পালনের অধিকার আছে।

ঘ. মানবাধিকার মানুষের ভালো ———————— বিকশিত করে।

ঙ. মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি ———————— কাজ।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র	ইউনিসেফ
খ. আইনের চোখে	মানবাধিকারের লঙ্ঘন
গ. নারী ও শিশু পাচার	শ্রদ্ধা করতে হবে
ঘ. সবার মানবাধিকারকে	জাতিসংঘ
ঙ. শিক্ষার অধিকার	সবাই সমান
	মৌলিক মানবাধিকার

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. মানবাধিকার কাকে বলে ?

খ. মানবাধিকারের প্রয়োজনীয়তা লিখ ?

গ. নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন কেন ?

ঘ. আমরা বাড়িতে কীভাবে মানবাধিকার চর্চা করতে পারি ?

ঙ. মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের কী করা উচিত ?

অষ্টম অধ্যায়

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সমাজের সদস্য ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার ভোগ করি। অধিকারের সাথে কর্তব্যের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। সেজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে। শিশু হিসেবে নিজেদেরকে নিরাপদে রাখাও আমাদের দায়িত্ব। আমরা শিশুরা যদি সুন্দরভাবে বড় হই তাহলে পরিবার, সমাজ, দেশ সবার মঙ্গল হবে। আমরা ভবিষ্যতে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠব। সমাজ ও দেশের উন্নয়নে কাজ করতে সক্ষম হব।

কাজেই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সম্পর্কে জানা উচিত। এ অধ্যায়ে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানব। শিশু হিসেবে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষায় আমাদের করণীয় কী সে সম্পর্কে জানব ।

সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আমরা সমাজের সদস্য। সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। এজন্য আমাদের সকলকে মিলেমিশে চলতে হবে। সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন, আচার-আচরণ মেনে চলতে হবে। সমাজে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ (যেমন রাস্তাঘাট, পুল-সেতু, যানবাহন, গাছপালা, ক্ষেত, পুকুর, পার্ক, ক্লাব ইত্যাদি) আছে যা আমাদের জীবনকে সহজ ও সুন্দর করে। এগুলো সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা সমাজের উন্নয়নে কাজ করব। বড়দের শ্রদ্ধা করব। ছোটদের ভালোবাসব। আমাদের সমাজে অনেক অসুবিধাগ্রস্ত মানুষ আছে। তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাব ও সহযোগিতা করব। সমাজে শান্তি নষ্ট হয় এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকব। অন্যের ক্ষতি করব না। সবার উপকার করার চেষ্টা করব। এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে সমাজজীবন আরও সুন্দর হবে। এর ফলে সমাজের সদস্যরা ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবে।

সমাজের প্রতি আমরা আর কী কী দায়িত্ব পালন করতে পারি সে সম্পর্কে চিন্তা করি ও লিখি।

১.
২.

৩.
৪.

রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন–

রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা

নাগরিক হিসেবে এটি আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আমরা রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলব। দেশের স্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে গুরুত্ব দিব।

আইন মেনে চলা

দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইনকানুন আছে। এছাড়াও সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। এসব আইন মেনে চলা নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য। কোনভাবেই এসব আইন আমরা অমান্য করব না। কারণ আইন অমান্য করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

নিয়মিত কর প্রদান

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য এ অর্থ প্রয়োজন হয়। নাগরিকদের দেয়া কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরকার এসব কাজ করে। তাই নিয়মিত কর দেয়া নাগরিকদের কর্তব্য।

ভোটদান

আমাদের দেশে নাগরিকগণ ১৮ বছর বয়স হলে ভোট দিতে পারে। এর মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের শাসনকাজে অংশগ্রহণ করে। ভোট দেয়া সব নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেয়া উচিত।

রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করা

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো সরকারের এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা। এজন্য আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

শিক্ষা লাভ

দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষিত নাগরিক অত্যন্ত প্রয়োজন। সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে

তোলা প্রত্যেক মা-বাবার দায়িত্ব। আর মনোযোগের সাথে লেখাপড়া করা আমাদের দায়িত্ব।

নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় শিশুর দায়িত্ব ও কর্তব্য

বাড়ির বাইরে নিরাপত্তা রক্ষা

আমরা প্রতিদিন ঘরের বাইরে বিভিন্ন ধরনের কাজ করি। এসব কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হই। নিচে এরকম দুটি দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানব।

ঘটনা– ১

রকিব বন্ধুদের সাথে খেলার জন্য একা ঘরের বাইরে গিয়েছিল। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো, কিন্তু সে ঘরে ফিরল না। রকিবের বাবা-মা পুলিশকে জানাল। দশদিন পর রকিবকে একটি গ্রাম থেকে পুলিশ উদ্ধার করল। জানা গেল দুজন অপরিচিত লোক তাকে দোকানে ডেকে নিয়ে আইসক্রিম খেতে দিয়ে অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে আটকে রেখেছিল। তারা রকিবের পরিবারের কাছে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছিল।

ঘটনা– ২

বিপাশা মায়ের সাথে স্কুলে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হওয়ার জন্য তারা স্কুলের সামনের 'ওভার ব্রীজ' ব্যবহার না করে নিচে দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করল। এ সময় একটি দ্রুতগামী বাস তাদেরকে ধাক্কা দিল। ফলে মা ও বিপাশা গুরুতর আহত হলো। অনেকদিন তাদেরকে হাসপাতালে থাকতে হলো। এতে তার লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হলো। ঘটনা দুটি থেকে আমরা কী শিখলাম? বন্ধুদের সাথে আলাপ করি।

আমরা প্রায়ই এ ধরনের ঘটনার কথা শুনে থাকি। এর ফলে আরও অনেক বেশি ক্ষতি হতে পারে। আমাদের অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। অপরিচিত কেউ কোন জিনিস খেতে দিলে তা খাওয়া উচিত নয়। যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি কোথাও যাওয়া বা খাওয়ার জন্য জোর করে তবে তা আশেপাশে থাকা অন্যদের জানানো উচিত। তাহলে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

রাস্তায় নানা কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অসাবধানে পথ চলা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এছাড়া ট্রাফিক নিয়ম না মেনে রাস্তায় চলাচল করলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন– আমরা অনেক সময় ফুটপাথ দিয়ে না হেঁটে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটি। জেব্রাক্রসিং

থাকলেও সেটি ব্যবহার না করে যেকোন স্থান দিয়ে রাস্তা পার হই। অনেক সময় রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৌড় দিই। বিভিন্ন জায়গায় ওভার ব্রীজ থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার না করে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করি। এসব কারণে প্রতিদিন অনেকেই দুর্ঘটনার শিকার হয়। আমরা নিজেরাও এ ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হতে পারি। রাস্তায় পথ চলার সময় আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। রাস্তায় চলার নিয়মগুলো মেনে চলার অভ্যাস করতে হবে। এজন্য আমরা যথাযথভাবে নিচের কাজগুলো করব।

নিয়ম মেনে রাস্তা চলি।

ওভার ব্রীজ দিয়ে রাস্তা পার হবো।

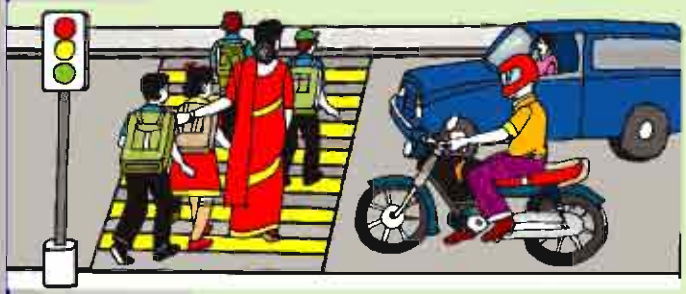

দুপাশে ভালো করে দেখে নিয়ে যেখানে জেব্রাক্রসিং আছে সেখান দিয়ে রাস্তা পার হবো।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে না হেঁটে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটব।

বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা

অনেক সময় বাড়িতে আমরা নানা রকম দুর্ঘটনার শিকার হই। ছুরি, কাঁচি দিয়ে খেলতে যেয়ে বা অসতর্ক ব্যবহারের জন্য হাত-পা কেটে ফেলি। খালি পায়ে বা ভেজা হাতে বা অসতর্কভাবে বৈদ্যুতিক তার ধরার ফলে অনেকে বিদ্যুৎপিষ্ট হয়। কখনো কখনো অনেকে ভুলে বা অজ্ঞতার কারণে ভুল ওষুধ বা কীটনাশক খায়। এর ফলে তাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। অনেকে ভুলে গ্যাসের চুলার চাবি খোলা রাখে। ফলে গ্যাস বের হয়ে জমে থাকে। জমে থাকা গ্যাসে আগুন জ্বালালে আমাদের শরীরে বা বাড়িতে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাটির চুলা অসতর্কভাবে ব্যবহারের কারণেও প্রায়ই আগুন লাগার ঘটনা শোনা যায়। এসব বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। দুর্ঘটনা এড়াতে আমরা কীভাবে সতর্ক থাকতে পারি তা নিচের ছকে লিখি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

আজকাল অনেক বাড়িতে, বিশেষ করে শহরে চুরি, ডাকাতি হয়। অনেক সময় মানুষের জীবনের ওপর হুমকি আসে। এ বিষয়েও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ঘরের দরজা ভালোভাবে আটকে রাখতে হবে। কোন অপরিচিত লোক যদি বাসায় এসে দরজা ধাক্কা দেয়, তবে দরজা খোলা উচিত নয়। যাদের বাবা-মা কাজ বা চাকরির জন্য ঘরের বাইরে থাকেন তাদেরকে এ বিষয়ে আরও সচেতন থাকতে হবে। তা হলে আমরা অনেকটা নিরাপদে থাকতে পারব।

প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স

বাড়িতে একটি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখতে হবে। এর ফলে কারো বিপদ হলে আমরা প্রথমে ঘরেই চিকিৎসা দিতে পারব। তারপর খুব দ্রুত অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে হবে।

বিদ্যালয়ে ও খেলার মাঠে নিরাপত্তা রক্ষা

বাড়ির মতো বিদ্যালয়ে এবং খেলার মাঠেও বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা অনেক সময় চেয়ার, টেবিল বা ডেস্কে উঠে লাফালাফি করি। দেয়াল বা গাছ বেয়ে উঠি। অসতর্কতার সাথে দোলনা বা অন্যান্য খেলার সামগ্রী ব্যবহার করি। এর ফলে পড়ে গিয়ে হাত, পা, মাথা বা শরীরের যেকোনো জায়গায় ব্যথা পেতে পারি।

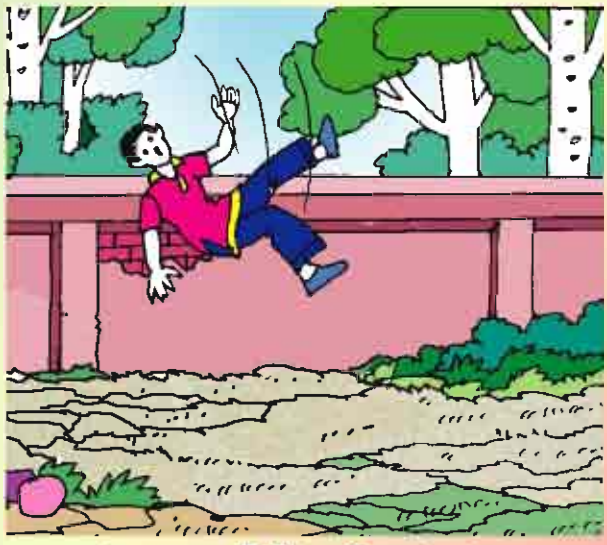

দেয়াল থেকে একটি শিশু মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।

অনেকে সাঁতার না জানলেও পুকুর বা অন্য কোথাও পানিতে নামে। ফলে অনেকে ডুবে যায়। এরকম অনেক কাজ আমরা প্রায়ই করে থাকি এর ফলে আমরা দুর্ঘটনায় পড়ি।

নিরাপত্তা নষ্ট হতে পারে এরকম কাজ শিশুদের করা উচিত নয়। নিজেদেরকে নিরাপদে রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব আমাদের। আমাদের সকলকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

আবার পড়ি

১. সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এগুলো সঠিকভাবে পালন করা উচিত।
২. বাড়ি ও বাড়ির বাইরে শিশু নানা রকম দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে।
৩. বাড়ি, রাস্তা, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ইত্যাদি জায়গায় শিশু যাতে দুর্ঘটনায় না পড়ে সে বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ

১. সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের তালিকা তৈরি করা।
২. দলগতভাবে শিশুর নিজেদের নিরাপদে রাখার উপায়ের তালিকা তৈরি করা।
৩. অভিনয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং নিরাপত্তা রক্ষার অনুশীলন করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ কোনটি সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্বের অবহেলা ?

ক. নিয়ম মানা　　খ. সম্পদ সংরক্ষণ

গ. সহযোগিতা করা　　ঘ. অন্যের ক্ষতি করা

১.২ আমাদের দেশে কত বছর বয়সে নাগরিক ভোট দিতে পারে ?

ক. ১৮　　খ. ২০

গ. ২২　　ঘ. ২৪

১.৩ দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ধরনের লোককে ভোট দেওয়া উচিত ?

ক. সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি　　খ. ধনী ও নাম করা ব্যক্তি

গ. নিজ দলের লোক　　ঘ. প্রভাবশালী ব্যক্তি

১.৪ রাস্তায় চলার সময় আমাদের কী করা উচিত নয় ?

ক. জেব্রাক্রসিং ব্যবহার　　খ. ওভারব্রীজ ব্যবহার

গ. ফুটপাথ ব্যবহার　　ঘ. রাস্তার মাঝ দিয়ে হাঁটা

১.৫ দেশের উন্নয়নে কী ধরনের নাগরিক প্রয়োজন ?

ক. শিক্ষিত　　খ. নিরক্ষর

গ. ব্যবসায়ী　　ঘ. রাজনৈতিক নেতা

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. অধিকার ও ———————— গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ।

খ. আমরা সমাজের অসুবিধাগ্রস্ত মানুষদের প্রতি ———————— দেখাব।

গ. আইন ভাঙলে সমাজে ———————— দেখা দিবে।

ঘ. আমাদের সবার বাড়িতে প্রাথমিক ———————— বাক্স থাকা উচিত।

ঙ. আমাদের ———————— দিয়ে রাস্তা পার হওয়া উচিত।

চ. রাস্তার মাঝখান দিয়ে না হেঁটে ———————— দিয়ে হাঁটব।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. অসাবধানে পথ চললে	নিরাপদে পথ চলা যায়
খ. ট্রাফিক নিয়ম মানলে	রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা
গ. সৎ ও যোগ্য লোককে ভোট দেওয়া	দুর্ঘটনায় পড়তে হয়
ঘ. কর্তব্যের সাথে নিবিড় সম্পর্ক আছে	করা উচিত নয়
ঙ. নিরাপত্তা নষ্ট হওয়ার মতো কাজ	নাগরিকের দায়িত্ব
	অধিকারের

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. সমাজের প্রতি তোমার পাঁচটি দায়িত্ব লেখ।

খ. রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিয়মিত কর দেওয়া উচিত কেন ?

গ. রকিবের গল্পটির মূল কথা লেখ।

ঘ. দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য রাস্তায় কীভাবে চলা উচিত ?

ঙ. তুমি কি রাস্তায় চলার সময় নিয়মগুলো মেনে চল ? না মানলে কী করা উচিত লেখ।

চ. যাদের মা-বাবা কাজ বা চাকরি করেন তাদের নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষায় কী করা উচিত ?

নবম অধ্যায়

আমরা সবাই সমান

আমাদের চারপাশে নানা রকম মানুষ আছে। আমরা যারা একই শ্রেণিতে পড়ালেখা করি তারা সবাই কিন্তু ঠিক একই রকম নই। কিছু কিছু বিষয়ে যেমন আমাদের অনেক মিল আছে তেমনি অনেক অমিলও আছে। যেমন– আমরা কেউ খুব কথা বলতে পছন্দ করি আবার কেউ একটু চুপচাপ থাকতে ভালোবাসি। কারো শখ ছবি আঁকা, কারো শখ গান শেখা, আবার কেউ হয়তো খেলাধুলায় খুব পারদর্শী। আমাদের প্রত্যেকের প্রতিভায় ভিন্নতা আছে, আচরণেও ভিন্নতা আছে। তবে কারো কারো আচরণ একটু বেশি অন্যরকম। আমাদের এই অন্যরকম বন্ধুরা আমাদের সাথে হয়তো বন্ধুত্ব করতে চায় না, সবার সাথে মিলেমিশে খেলতেও চায় না। ওরা সবসময় চুপচাপ থাকে, অন্যদের মতো হৈ–চৈ না করে একা একা থাকতে চায়। তাদেরকে নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয় না। অন্যের চোখে চোখে তাকায় না। ওদের মধ্যে অনেকে আছে যারা অন্যের স্পর্শ সহ্য করতে পারে না তাই ওদের আদর করতে গেলে রেগে যায়, দেখে মনে হয় যেন ভালোবাসা বোঝে না। কোনো কিছু প্রয়োজন হলে মুখে না বলে হাত ধরে সেই জিনিসের কাছে টেনে নিয়ে যায়। আমাদের এই বন্ধুরা অনেক সময় স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না কারণ ওরা অনেক শব্দ মনে রাখতে পারে না। ওরা কখনো কখনো একই শব্দ বার বার বলতে থাকে। অনেক সময় ওরা নিজের ভাষায় কথা না বলে অন্যের ভাষায় কথা বলে; যেমন– 'আমি ভাত খাব' না বলে বলতে পারে 'রাজু ভাত খাবে'। ওরা একই কাজ একটানা করতে থাকে। যেমন– বারবার সুইচ অন–অফ করা বা মাথা ঘোরানো, চোখের সামনে হাতের আঙ্গুল নাড়ানো, শরীর দোলানো ইত্যাদি।

তাদের এই আচরণ 'অটিজম' নামের একটি বিকাশগত সমস্যার ফলে হয়। এই সমস্যা আক্রান্ত শিশুদের 'অটিস্টিক শিশু' বলে। এটি কোনো রোগ নয় যে চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে। তাদের সমস্যার ধরনগুলো জেনে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমেই তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত করা সম্ভব।

নিচের ছবি থেকে ওদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নিই–

তবে জেনে রাখো, এইসব লক্ষণগুলোর কোনো কোনোটি সাময়িকভাবে অনেক শিশুর মধ্যে থাকতে পারে। তাই এক বা একাধিক লক্ষণ দেখেই কোনো শিশুকে অটিস্টিক ভাবা ঠিক হবে না। কেবলমাত্র শিশুকে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তার আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অটিস্টিক শিশু শনাক্ত করতে পারেন।

এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে অটিজম কী। আমাদের বিদ্যালয় বা শ্রেণিতে হয়তো এই ধরনের বন্ধু থাকতে পারে। তাদের সমস্যাগুলো আমরা জানলাম, এবার ভাবো তো তাদেরকে আমরা কীভাবে সহযোগিতা করতে পারি? আমরা আমাদের এই বন্ধুদের সাথে এমন কোনো আচরণ করব না যাতে তারা কষ্ট পায় বা উত্তেজিত হয়। তাই আমরা জেনে নেব আমাদের বন্ধু কী পছন্দ করে আর কোনটি করলে তার কষ্ট হয়। সবাই মিলে তাদেরকে সাহায্য করবো। খেয়াল রাখবো তারা যেন বিরক্ত না হয়। আমরা আমাদের শ্রেণি শিক্ষককেও সহায়তা করব যেন তিনি তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে পারেন। তাহলেই তারা আমাদের সাথে সমানভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে।

আবার পড়ি

১. অটিস্টিক বন্ধুদের আচরণ ভিন্ন হয় তবে কারো কারো আচরণ একটু বেশি অন্যরকম।
২. বন্ধুরা সবসময় চুপচাপ থাকে। নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দেয় না। অনেকেই সরাসরি চোখের দিকে তাকায় না।
৩. কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু চমৎকার প্রতিভার অধিকারী হয়।
৪. আমরা আমাদের শ্রেণি শিক্ষককেও সহায়তা করব যেন তিনি তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে পারেন। তাহলেই আমাদের সকলের সহযোগিতায় অটিস্টিক বন্ধুরা আমাদের সাথে সমানভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে।

পরিকল্পিত কাজ

১. অটিস্টিক বন্ধুদের বৈশিষ্ট্যের তালিকা তৈরি করা।
২. এ সকল বন্ধুদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের ভূমিকাভিনয় করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√)দাও।

১.১ অটিস্টিক বন্ধুরা কেমন আচরণ করে ?

ক. সকলের সাথে খেলাধুলা করে খ. সকলের সাথে বন্ধুত্ব করে
গ. চুপচাপ নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকে ঘ. সকলের সাথে মিলেমিশে থাকে

১.২ অটিস্টিক বন্ধুদের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?

ক. অনেক সময় স্বাভাবিক শব্দ শুনেই উত্তেজিত হয়

খ. সব বন্ধুদের সাথে ভালো আচরণ করে

গ. সবার কথা শুনতে পছন্দ করে

ঘ. নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. অটিস্টিক বন্ধুরা আমাদের সাথে ———————— করতে চায় না।

খ. আদর করতে গেলে ———————— যায়।

গ. শিশুরা আলো, গতি, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ বা স্বাদের ক্ষেত্রে অতি ————————।

ঘ. অনেক সময় স্বাভাবিক শব্দ শুনেই ———————— হয়।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. অটিস্টিক শিশু শনাক্তকরণ	চোখে সমস্যা
খ. অটিজম	বিকাশগত সমস্যা
গ. অটিস্টিক শিশুর প্রতিভা	পরীক্ষা নিরীক্ষা
	গান করা, ছবি আঁকা

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. কোন শিশুদের অটিস্টিক শিশু বলে ?

খ. অটিস্টিক বন্ধুদের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর ?

গ. তোমার শ্রেণির অটিস্টিক বন্ধুদের তুমি কীভাবে সহযোগিতা করতে পার ?

দশম অধ্যায়

গণতান্ত্রিক মনোভাব

আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন রকম কাজ করি। এসব কাজ করতে যেয়ে আমাদের অনেক সময় নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিভিন্নজন বিভিন্নরকম মত দিতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। আবার কারো একার মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিলে তা সঠিক নাও হতে পারে। অন্যরাও সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে আপত্তি করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন ঐক্যমত। অধিকাংশ লোকের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সে সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হবে। এভাবে অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সে সিদ্ধান্তকে সম্মান করাকেই বলে গণতান্ত্রিক মনোভাব। গণতান্ত্রিক মনোভাব একটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণ। সমাজের সব সদস্যের এ গুণটি থাকা উচিত।

আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে পারি তার একটি উদাহরণ পড়ি।

শ্রেণিতে শ্রেণিনেতা নির্বাচন করা হবে। কারা শ্রেণিনেতা হতে ইচ্ছুক শিক্ষক জানতে চান। মোট পাঁচজন শিক্ষার্থী ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু শ্রেণিনেতা হবে মাত্র দুইজন। শিক্ষক একটি বুদ্ধি আঁটলেন। তিনি আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নাম বোর্ডে লিখলেন। সব শিক্ষার্থীকে দুই টুকরা করে কাগজ দিয়ে বোর্ডে লেখা নামগুলো থেকে তাদের পছন্দের দুজন শিক্ষার্থীর নাম দুটি কাগজে লিখে ভাঁজ করে একটি বাক্সে রাখতে বললেন। এভাবে সবার মত দেয়া সম্পন্ন হলে শিক্ষক কাগজগুলো খুলে গণনা করলেন এবং কার পক্ষে কয়জন মত দিয়েছে তা বোর্ডে লেখা নামগুলোর পাশে লিখলেন। এভাবে যে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে তাকে করা হলো প্রথম শ্রেণিনেতা । আর যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে সে নির্বাচিত হলো দ্বিতীয় শ্রেণিনেতা । সবার মতামত নিয়ে শ্রেণিনেতা নির্বাচিত হয়েছে বলে সবাই হাসিমুখে তাদেরকে বরণ করে নিল।

শ্রেণিনেতা নির্বাচনে গণতন্ত্রের চর্চা

উপরের ঘটনাটি থেকে আমরা কী শিখলাম? বন্ধুদের সাথে আলাপ করে খাতায় লিখি।

আমরা অনেক সময় খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ে বা অন্য কোথাও দলগতভাবে কাজ করি। দলে কাজ করতে হলে একজন দলনেতা নির্বাচন করতে হয়। দলনেতার নেতৃত্বেই দলের কাজ করা হয়। দলের নেতা নির্বাচনের সময়ও শ্রেণির নেতা নির্বাচনের মত গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাতে হবে। সবার ঐক্যমতের ভিত্তিতে দলনেতা নির্বাচন করতে হবে।

গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন। এর মূলকথা হলো সবার মতকে সম্মান করা এবং অধিকাংশের মত অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়া। গণতন্ত্রে কাউকে জোর করে কিছু করা হয় না। অধিকাংশ ব্যক্তির মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে সবাই এতে খুশি থাকে। তারা পরমতসহিষ্ণু হয় এবং সহনশীল হতে শেখে। ফলে সবাই মিলেমিশে চলতে শেখে যা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি নিয়ে আসে। তাই গণতান্ত্রিক মনোভাব শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। গণতন্ত্র মানুষকে মত প্রকাশের সুযোগ দেয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের জনগণ দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে। দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলকে তাই গণতান্ত্রিক মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। এজন্য আমরা বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ইত্যাদি সব জায়গায় গণতান্ত্রিক আচরণ করব। এর ফলে আমাদের দেশের গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে।

বাড়িতে গণতান্ত্রিক মনোভাবের চর্চা করি

আমরা বাড়িতে বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাব। নিচের কাজগুলোসহ পরিবারের বিভিন্ন কাজে মা-বাবা, ভাই-বোন ও অন্য সকলে মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব।

- কোথায় ও কীভাবে বেড়াতে যাব?
- ঘরের কী জিনিস কিনব?
- কীভাবে ঘর সাজাব?
- উৎসব-অনুষ্ঠানে কী করব?

পরিবারে গণতান্ত্রিক মনোভাব

শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র চর্চা করি

শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজেও আমরা গণতান্ত্রিক আচরণ করব। অধিকাংশের মত অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করব।

শ্রেণির বিভিন্ন কাজ, যেমন– চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ গোছানো, শ্রেণিকক্ষ সাজানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি সম্পর্কে সব সহপাঠীর সাথে আলোচনা করব। অধিকাংশের মতামত নিয়ে কাজগুলো সম্পন্ন করব।

দলগত কাজে গণতান্ত্রিক মনোভাব

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন ইত্যাদি ব্যাপারেও আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব। অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করব এবং পরস্পরকে সহায়তা করব।

দলগত কাজে গণতান্ত্রিক মনোভাব

এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা গণতান্ত্রিক আচরণ করব। তাহলে আমাদের দেশটা একটি উত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

আবার পড়ি

১. গণতান্ত্রিক মনোভাব একটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণ।
২. এতে অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে।
৩. আমাদের সমাজটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সকলকে গণতান্ত্রিক মনোভাব অর্জন ও চর্চা করতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ

১. শ্রেণিতে দলগতভাবে শিক্ষামূলক কাজ করার সময় শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলনেতা নির্বাচন করা।
২. শ্রেণিনেতা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা।
৩. অভিনয়ের মাধ্যমে যে কোন বিষয়ে গণতান্ত্রিক মনোভাবের চর্চা করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ?

ক. একজনের মত　　খ. দলনেতার মত
গ. ২/৩ জনের মত　　ঘ. অধিকাংশের মত

১.২ গণতন্ত্রের অর্থ কী ?

ক. পরিবারের শাসন　　খ. ব্যক্তির শাসন
গ. রাজনৈতিক দলের শাসন　　ঘ. জনগণের শাসন

১.৩ গণতন্ত্রে কোনটি গ্রহণযোগ্য নয় ?

ক. জোর করে মত চাপিয়ে দেওয়া　খ. পরমতসহিষ্ণুতা
গ. সহনশীলতা　　ঘ. শান্তি ও সম্প্রীতি

১.৪ আমাদের কোথায় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চা করা উচিত ?

ক. বাড়ি　　খ. বিদ্যালয়
গ. শ্রেণিকক্ষ　　ঘ. সকল ক্ষেত্রে

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. অধিকাংশের ———— ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বলে গণতান্ত্রিক মনোভাব।
খ. গণতন্ত্রের অর্থ ———— শাসন।
গ. আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ———— করব।
ঘ. গণতন্ত্র আমাদের ———— পরিচালনার মূলনীতি।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে	গণতন্ত্র
খ. গণতান্ত্রিক মনোভাব	সিদ্ধান্ত গহণ করতে হবে
গ. বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	জনগণের শাসন
ঘ. দলনেতা নির্বাচন করা উচিত	একটি সামাজিক গুণ
	গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. গণতান্ত্রিক মনোভাব কাকে বলে ?

খ. সমাজের সদস্যদের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত কেন ?

গ. গণতন্ত্র কীভাবে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়তা করে ?

ঘ. বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সবার গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত কেন ?

ঙ. আমরা বাড়িতে কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করতে পারি ?

একাদশ অধ্যায়

নারী-পুরুষ সমতা

একটি দেশের উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। আর এই মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই রয়েছে। আগেই আমরা জেনেছি সমাজে বিভিন্ন পেশা, শ্রেণি, বয়সের মানুষ রয়েছে। আবার এরা সবাই ছেলেশিশু বা মেয়েশিশু হিসেবে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের সাথে বেড়ে উঠে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মা-বাবা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। তাদের মধ্যে কেউ নারী, কেউ পুরুষ। আবার বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যেও নারী ও পুরুষ রয়েছেন। এভাবে সমাজে নারী-পুরুষ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক নারী। নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ না থাকলে দেশের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। আবার নারী ও পুরুষ একই রকম সুযোগ সুবিধা বা অধিকার ভোগ করতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয় না। এ প্রসঙ্গে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন,

"এ পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

আমাদের দেশে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়টি বর্তমানে খুব গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। সামাজিক বাধার কারণে অনেক মেয়েশিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হতো না। আর এর মূলে ছিল মেয়েদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদা।

এখানে আমরা বাংলাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত, মহীয়সী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কথা বলতে পারি। যিনি শতবর্ষ আগে বলেছিলেন, "আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে, একই।" আমরা এখন বেগম রোকেয়ার অবদান সম্পর্কে জানব।

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকে ভাইদের লেখাপড়া দেখে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। কিন্তু সে সময় বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। রোকেয়ার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ

একাদশ অধ্যায়

নারী-পুরুষ সমতা

একটি দেশের উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। আর এই মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই রয়েছে। আগেই আমরা জেনেছি সমাজে বিভিন্ন পেশা, শ্রেণি, বয়সের মানুষ রয়েছে। আবার এরা সবাই ছেলেশিশু বা মেয়েশিশু হিসেবে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের সাথে বেড়ে উঠে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মা-বাবা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। তাদের মধ্যে কেউ নারী, কেউ পুরুষ। আবার বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যেও নারী ও পুরুষ রয়েছেন। এভাবে সমাজে নারী-পুরুষ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক নারী। নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ না থাকলে দেশের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। আবার নারী ও পুরুষ একই রকম সুযোগ সুবিধা বা অধিকার ভোগ করতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয় না। এ প্রসঙ্গে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন,

"এ পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

আমাদের দেশে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়টি বর্তমানে খুব গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। সামাজিক বাধার কারণে অনেক মেয়েশিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হতো না। আর এর মূলে ছিল মেয়েদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদা।

এখানে আমরা বাংলাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত, মহীয়সী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কথা বলতে পারি। যিনি শতবর্ষ আগে বলেছিলেন, "আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে, একই।" আমরা এখন বেগম রোকেয়ার অবদান সম্পর্কে জানব।

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকে ভাইদের লেখাপড়া দেখে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। কিন্তু সে সময় বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। রোকেয়ার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ

হয় বল। এভাবে শৈশব থেকেই তাদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার কারণে ছেলে ও মেয়েরাও নিজেদের মানুষ হিসেবে ভিন্ন ভাবতে শুরু করে। বিভিন্ন কারণে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ না করে পড়াশুনা বন্ধ করে দেয় বা ঝরে পড়ে।

ভাইবোন এক সাথে ঘর গোছাচ্ছে

ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ও সরকারি বিভিন্ন নীতিমালায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়। সবার জন্য শিক্ষা বা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মসূচী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচীর কারণে প্রাথমিক স্তরে ছেলে-মেয়ে উভয় শিক্ষার্থী সবাই সমানভাবে লেখাপড়া করছে। বড় হয়ে এসব শিক্ষার্থী ছেলে বা মেয়ে হয় না বরং মানুষ হিসেবে সমাজের উন্নয়নে অংশ নিচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা শ্রেণিকক্ষে এক সাথে পড়ছে

বিদ্যালয়ে বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, নারী ও পুরুষ সমাজে সর্বত্রই বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কেউ কৃষি কাজ করেন। কেউ ব্যবসা করেন। কেউ শিক্ষকতা করেন। কেউ শিল্পকারখানায় কাজ করেন। কেউ চাকরি করেন। আবার কেউ কেউ দিনমজুরি করেন। এভাবে সবক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানভাবে অবদান রাখছে। কিন্তু কোথাও কোথাও

নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা বা মজুরি পায় না। এভাবে আরও নানাভাবে নারীর অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। নারী-পুরুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমাতে ১৯১০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিবস পালনের পেছনের ঘটনাটা জেনে নেই।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে একটি সেলাইয়ের কারখানায় নারী ও পুরুষ শ্রমিক একসাথে কাজ করত। কিন্তু দৈনিক বারো ঘন্টা কাজ করেও তারা ন্যায্য মজুরি পেত না। ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ কারখানার নারী শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি ও আট ঘন্টা শ্রমের দাবিতে রাজপথে আন্দোলন করেন। সে সময় তাদের অনেককে পুলিশ নির্যাতন ও গ্রেফতার করে। এই দিনটিকে সামনে রেখে ১৯০৮ সালে নিউইয়র্ক শহরের হাজার হাজার নারী শ্রমিক শিশুশ্রম বন্ধ ও নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। ১৯১০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে জার্মান নারী নেতা 'কারা জেটকিন' ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই দিনটিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করাসহ নানা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। সমাজের নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাবও করা হয়।

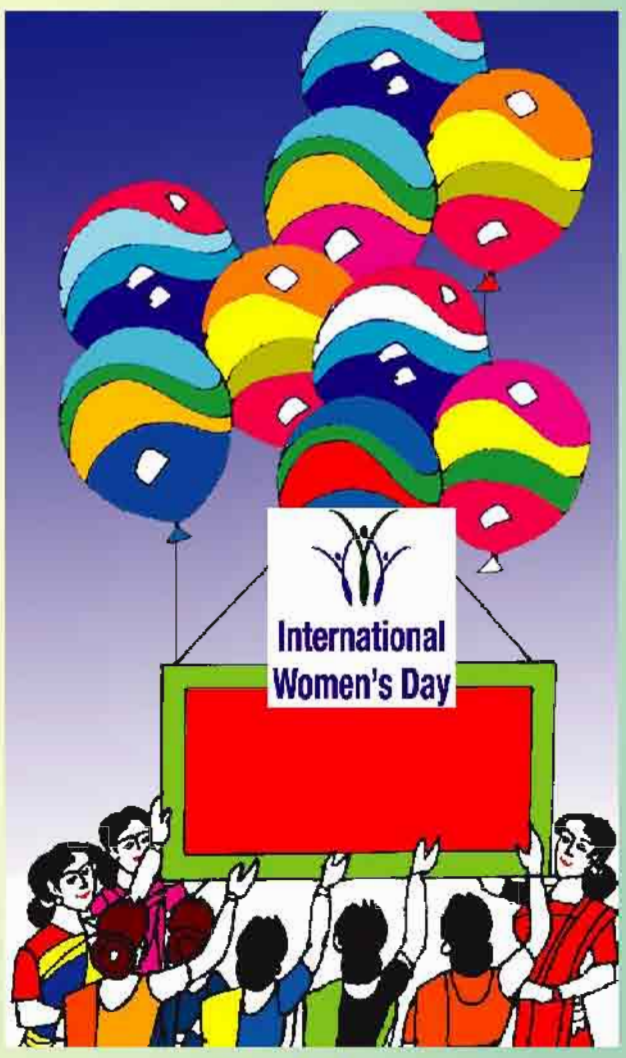

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

নারী নির্যাতন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ছাড়াও পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতিমালা রয়েছে। এই সনদগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতনের খবর পাই। যার ফলে নারীর মানবাধিকার খর্ব হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (২০১২) মতে, বাংলাদেশে প্রতি ঘন্টায় একজন করে নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারী নির্যাতনের মূল কারণ হচ্ছে পুরুষের তুলনায় নারী বা মেয়েদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদা। এছাড়াও শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, বিভিন্ন কুসংস্কার নারী নির্যাতনের কারণ।

সমাজে নারী নির্যাতনের প্রভাব অনেক ক্ষতিকর। যেমন– পারিবারিকভাবে নারী নির্যাতন হলে নির্যাতিত নারীর শারীরিক, মানসিক ক্ষতি হয়। যেসব পরিবারে মায়েরা নির্যাতনের শিকার হয় সেসব পরিবারে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধা পায়। নির্যাতিত নারী সময়মতো কাজে যেতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়।

পারিবারিকভাবে নারী নির্যাতনের একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে যৌতুক। যা একটি ব্যাধির মতো সমাজে ছড়িয়ে আছে। যৌতুক দিতে হয় বলে মেয়েশিশুকে পরিবারের বোঝা মনে করা হচ্ছে। রাস্তাঘাটে, বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথেও মেয়েরা নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে।

এধরনের নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সমাজের উপরই। যদি আমরা বাড়ি, বিদ্যালয় ও সবক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করার প্রতি যত্নবান হই তবে নারী নির্যাতনও বন্ধ হবে।

তাই ছোটবেলা থেকেই কাউকে ছেলে বা কাউকে মেয়ে এভাবে না দেখে সবাইকে মানুষ হিসেবে দেখতে হবে। সমাজের উন্নতির জন্য আমরা বাড়িতে মা-বাবাকে সাহায্য করব। কোন কাজ ছেলের বা কোন কাজ মেয়ের বলে মনে করব না। পরিবারের মা-বোন ইত্যাদি মেয়ে সদস্যদের প্রতি এবং পরিবারের বাইরে সকল মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। নিজের কাজ নিজে করব। সহপাঠী ছেলে বা মেয়ে যেই হোক একসাথে পড়ালেখা করব, খেলা করব। বাড়িতে, বিদ্যালয়ে বা রাস্তাঘাটে কোন মেয়ে যাতে নির্যাতিত বা হয়রানির শিকার না হয়, তারা যেন নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে সে বিষয়ে আমরা সবসময় সচেতন থাকব। এভাবে ছেলেমেয়ে সকলে মিলেমিশে চলার মধ্য দিয়েই আমরা হতে পারি প্রকৃত মানুষ।

আবার পড়ি

১. আমরা কাউকে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে না দেখে বরং মানুষ হিসেবে দেখব।
২. পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে নয় বরং নারী-পুরুষের সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভিত্তিতেই সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব।
৩. নারীর পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।
৪. নারী নির্যাতন মানুষ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

পরিকল্পিত কাজ

১. গল্প, অভিনয়, উদাহরণ, নারী দিবস পালন ইত্যাদির মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা ও সম-অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ একটি দেশের উন্নয়নের মূলে কী রয়েছে?

ক. সরকার　　খ. পরিবেশ
গ. মানুষ　　ঘ. ভৌগোলিক অবস্থা

১.২ বেগম রোকেয়া যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম কী ?

ক. সাখাওয়াত গার্লস স্কুল　　খ. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল
গ. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল　　ঘ. বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল

১.৩ কোন দিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয় ?

ক. ৮ই জানুয়ারি　　খ. ৮ই ফেব্রুয়ারি
গ. ৮ই মার্চ　　ঘ. ৮ই এপ্রিল

১.৪ কোন সাল থেকে নারী দিবস পালন শুরু হয়?

ক. ১৯১০ সাল　　খ. ১৯২০ সাল
গ. ১৯৩০ সাল　　ঘ. ১৯৪০ সাল

১.৫ সাধারণত বাড়িতে ঘর গোছানো, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করা, মাকে রান্নার কাজে সাহায্য করা এগুলো কে করে ?

ক. ছেলেশিশু খ. মেয়েশিশু

গ. ছেলে ও মেয়ে শিশু উভয়ই ঘ. বড় যারা

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. সমাজে ছেলেশিশু, মেয়েশিশু পরিবারের বিভিন্ন ———— সাথে বেড়ে উঠে।

খ. বেগম রোকেয়া ———— সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

গ. পারিবারিকভাবে নারী নির্যাতনের একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে ————।

ঘ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ———— ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ না থাকলে	১৯৩২ সালে
খ. বেগম রোকেয়া স্কুল শুরু করেন	ভাগলপুরে
গ. বেগম রোকেয়া মারা যান	দেশের উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হয়
ঘ. কারা জেটকিন	মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে
ঙ. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল	জার্মান নারীনেত্রী
	১৮৮০ সালে

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার অবদান অল্প কথায় লেখ।

খ. আমাদের সমাজে ছেলেশিশু ও মেয়েশিশুর প্রতি কী ধরনের আচরণ করা হয় ?

গ. অল্প কথায় নারী দিবসের বর্ণনা দাও।

ঘ. নারী নির্যাতনের মূল কারণগুলো কী ?

ঙ. নারী নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাবগুলো কী ?

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও তাদের সংস্কৃতি

বাংলাদেশে অনেকগুলো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে ১১টি জাতিসত্তা অতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে। এরা হচ্ছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখুয়া, চাক, খ্যাং, খুমি এবং লুসেই। বাংলাদেশের উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাংশের বৃহত্তর ময়মনসিংহে রয়েছে গারো, হাজং, কোচ এবং বৃহত্তর সিলেটে রয়েছে খাসি, পাত্র ও মণিপুরি জনগোষ্ঠী। আবার বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি এলাকায়ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। যেমন– সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহালি, মালো, মুন্ডা, মালপাহাড়ি ইত্যাদি। এছাড়াও দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় বসবাস করেন রাখাইন জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। যেমন– রাজবংশী, সূর্যবংশী বর্মণ, ডালু, হদি, মাহাতো, বানাই, পাথর, কোল ইত্যাদি।

মানচিত্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অবস্থান লক্ষ করি।

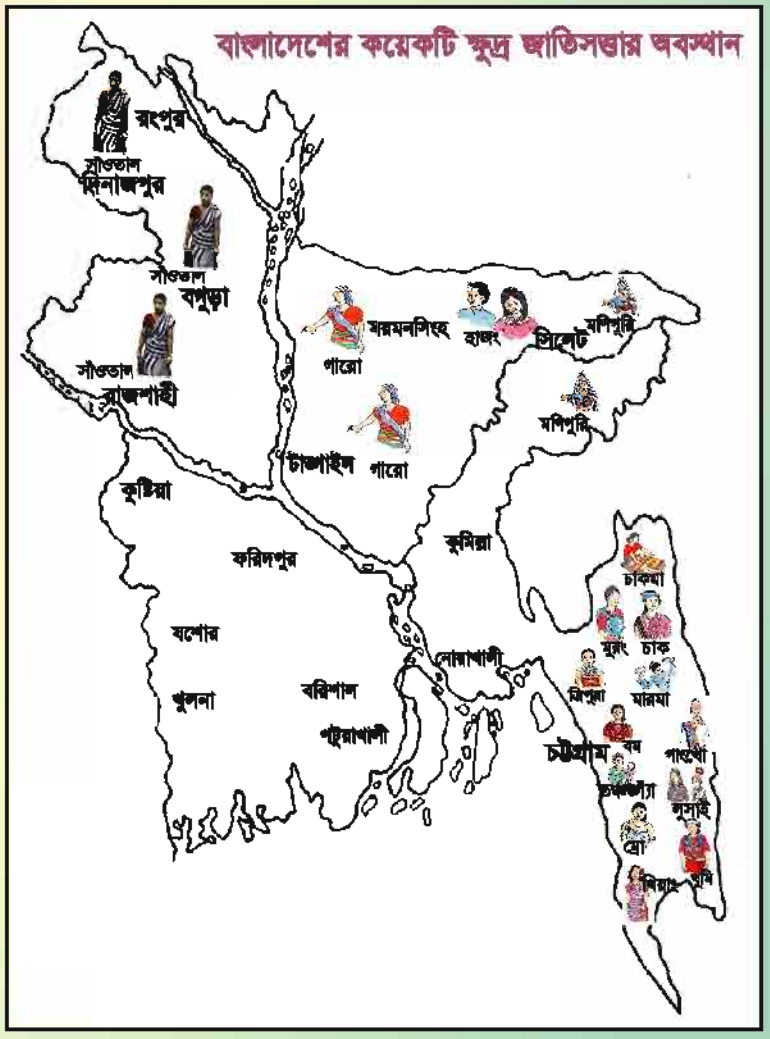

চতুর্থ শ্রেণিতে আমরা চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরি এই চারটি জাতিসত্তার সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনেছি। এবার আমরা পাহাড় ও সমতলে বসবাসকারী আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা যেমন– গারো, খাসি, ম্রো, ত্রিপুরা এবং ওঁরাওদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানব।

গারো

গারো জাতিসত্তাদের বসবাস বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, হালুয়াঘাট ও আশেপাশের এলাকায়। তবে বৃহত্তর সিলেট এবং সুনামগঞ্জ জেলায়ও কিছুসংখ্যক গারো রয়েছেন। গারো জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে 'আচিকমান্দি' বা পাহাড়ি মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে।

বাসস্থান

অতীতে গারোরা বিভিন্ন পাহাড়ের পাদদেশে অথবা নদীর ধারে তাদের বাড়িগুলো নির্মাণ করত। এই বাড়িগুলো সাধারণত দুচালা বিশিষ্ট দীর্ঘ আকারের হতো। এ ধরনের বাড়ির নাম ছিল 'নকমান্দি'। বর্তমানে এ ধরনের বাড়িঘর দেখা যায় না। বর্তমানে তারা সমতল বাংলাদেশের স্বাভাবিক টিনের চাল বা অন্যান্য প্রচলিত বাড়ির মতই বাড়ি তৈরি করে।

সমাজব্যবস্থা

গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ মা পরিবারের প্রধান এবং মেয়েরা পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আর বাবা পরিবারের দেখাশোনা করেন। বিয়ের পরে তিনি স্ত্রীর সাথে শ্বশুরবাড়িতে থাকেন এবং তার কর্তব্য পালন করেন। তবে বর্তমানে মাতৃতান্ত্রিক প্রথা চালু থাকলেও দেশের বাঙালি সমাজের মতো তাদের আচরণ ও অনুশীলন পরিবর্তিত হচ্ছে।

ভাষা

বাংলাদেশের গারোরা 'অবেং' ভাষায় কথা বলে, তবে এই ভাষার কোন লিখিত রূপ নেই।

ধর্ম

গারোদের অধিকাংশই বর্তমানে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। তারা বড়দিনসহ খ্রিষ্টানদের অন্যান্য উৎসবাদি পালন করে। গারোদের সনাতনী ধর্মের নাম 'সাংসারেক'। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর অঞ্চলে কিছু গারো এই ধর্মে বিশ্বাসী।

খাদ্যাভ্যাস

গারোরা ভাতের সাথে মাছ, মাংস, শাকসবজি অর্থাৎ বাঙালীদের মতো স্বাভাবিক খাবারই খায়। তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের একটি হচ্ছে কচি বাঁশের কোড়ল দিয়ে রান্না করা খাদ্য।

পোশাক

গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে আনফেং ও দকবান্দা বা দকশাড়ি আর পুরুষদের পোশাক শার্ট, লুঙ্গি, ধুতি।

উৎসব

গারোদের প্রধান উৎসবের নাম 'ওয়াংগালা'। এটি সূর্যের প্রতীক এবং জমির উর্বরতার

গারোদের উৎসব

দেবতা 'সালজং' এর সম্মানে উদযাপিত হয়। উৎসবের শুরুতেই কৃষিজমিতে অর্ঘ্য নিবেদন করে গ্রামের শিশু, নারী, পুরুষ সবাই আনন্দে মেতে উঠে।

খাসি

বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল এবং হবিগঞ্জ জেলায় প্রধানত খাসি জনগোষ্ঠী বাস করে। অতীতে সিলেট অঞ্চলে জয়ন্তা বা জৈন্তিয়া নামে একটি রাজ্য ছিল বলে জানা যায়। ধারনা করা হয় যে, খাসি জাতিসত্তারা আগে ঐ রাজ্যে বাস করত।

সমাজব্যবস্থা

খাসি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। মায়েদের সূত্র ধরেই তাদের দল, গোত্র ও বংশ গড়ে উঠে।

পারিবারিক সম্পত্তির বেশিরভাগের উত্তরাধিকারী হয় পরিবারের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। তারা খুব সহজ সরল জীবনযাপন করে। খাসিরা সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে একটি জনগোষ্ঠীর নাম 'নার' বা 'প্নার' যাদের লোকসংখ্যার বেশিরভাগই পান চাষ করে। মৌমাছি চাষও তাদের জীবিকার অংশ।

খাদ্যাভ্যাস

খাসিদের প্রধান খাদ্যগুলো হলো ভাত, মাংস, শুঁটকিমাছ, মধু ইত্যাদি। তারা পান সুপারিকে খুবই পবিত্র মনে করে। কোন অতিথি তাদের বাড়িতে বেড়াতে এলে তারা পান সুপারি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে।

ধর্ম

খাসিরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করে। তাদের প্রধান দেবতার নাম 'উব্লাই নাংথউ' যাকে তারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মনে করে। তারা পিতাকে দেবতা মনে করে পূজা করে।

পোশাক

খাসি মেয়েরা 'কাজিম পিন' নামক ব্লাউজ ও লুঙ্গি পরে। আর ছেলেরা পকেট ছাড়া জামা ও লুঙ্গি পরে যার নাম 'ফুংগ মারুং'।

খাসি মা ও শিশু

ভাষা

খাসিদের নিজস্ব ভাষা আছে যার নাম 'মন-খেমে'। তবে এই ভাষায় কোনো লিখিত বর্ণমালা নেই।

উৎসব

খাসি সমাজে নাচ-গান খুবই প্রিয়। সকল ধরনের অনুষ্ঠান যেমন– পূজা-পার্বণ, বিয়ে, খরা, অতিবৃষ্টি, ফসলহানি, মৃতের সৎকারে তারা নাচ, গান, উৎসবের আয়োজন করে।

ম্রো

পার্বত্য অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে চতুর্থ হলো ম্রো জাতিসত্তা। ম্রো রা নিজেদের ম্রো বা অতীতে 'মারুসা' বললেও বাঙালিরা কখনো কখনো তাদের 'মুরং' ও বলে থাকে। বান্দরবান জেলার রুমা, থানচি, লামা ও আলীকদম উপজেলায় তারা বসবাস করে। বান্দরবান শহরের কাছে চিম্বুক পাহাড়ে গেলেই ম্রোদের দেখা যায়।

সমাজব্যবস্থা

ম্রো সমাজে বহুদল ও গোত্র রয়েছে। ম্রো পরিবারের প্রধান হলেন পিতা। তাদের রয়েছে গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। ম্রোরা তাদের বাড়িকে 'কিম' বলে। সাধারণত বাঁশের বেড়া ও ছনের চাল দিয়ে মাচার উপরে তারা বাড়ি তৈরি করে।

ম্রো নারী, পুরুষ ও শিশু

পোশাক

ছোট বড় সব মেয়ে কোমরের চারিদিকে যে কাপড় পরে তার নাম 'ওয়াংলাই'। পুরুষেরা খাটো সাদা কাপড় পরে।

খাদ্যাভ্যাস

ম্রোদের প্রধান খাদ্য ভাত, শুঁটকিমাছ ও বিভিন্ন ধরনের মাংস। তাদের অন্যতম সুস্বাদু খাবারের নাম 'নাম্পী'।

ধর্ম

ম্রোরা সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রিস্ট ধর্মও গ্রহণ করেছে। তাদের নিজস্ব ধর্মের নাম 'তোরাই'। এছাড়াও ম্রো সমাজে 'ক্রামা' নামে আরেকটি ধর্মমত রয়েছে।

উৎসব

জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ম্রোরা বিভিন্ন আচার উৎসব পালন করে। ম্রো সমাজের একটি রীতি হলো শিশুদের বয়স ৩ বছর হলে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের কানেই ছিদ্র করে দেয়া হয়।

ত্রিপুরা

বাংলাদেশের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলায় ত্রিপুরারা বসবাস করেন। তবে বেশিরভাগই থাকেন খাগড়াছড়ি জেলায়। এছাড়া বাংলাদেশের সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম জেলায়ও কিছু সংখ্যাক ত্রিপুরা বাস করে।

সমাজব্যবস্থা

ত্রিপুরারা তাদের সমাজে দলবদ্ধভাবে বাস করে। দলকে তারা 'দফা' বলে। তাদের মোট ৩৬টি 'দফা' আছে। এর মধ্যে ১৬টি বাংলাদেশে বাকি ২০টি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের ত্রিপুরারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিকারী। তবে তাদের বংশ গণনা করা হয় মা-বাবা দুই ধারায়ই। যেমন– ছেলে সন্তান বাবার গোষ্ঠী আর মেয়ে সন্তান মায়ের গোষ্ঠীর অধিকারী হয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার এভাবেই নির্ধারিত হয়। ত্রিপুরাদের ঘরগুলো সাধারণত চাকমা ও মারমাদের তুলনায় উঁচু। ঘরে উঠার জন্য তারা সিঁড়ি ব্যবহার করে।

ধর্ম

পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মের অনুসারী। তারা হিন্দুধর্মের দুর্গাপূজা উৎসব পালন করে। তবে নিজস্ব কিছু দেব-দেবীর উপাসনাও তারা করে থাকে। যেমন– গ্রামের সকল লোকের মঙ্গলের জন্য তারা 'কের' পূজা করে।

পোশাক

ত্রিপুরা ছেলে ও মেয়েরা নানা রং ও নকশার পোশাক পরে। নারীদের পোশাকের নিচের অংশকে 'রিনাই' ও উপরের অংশকে 'রিসা' বলা হয়। গ্রামে পুরুষরা ধুতি, গামছা, লুঙ্গি, জামা পরে। নারীরা নানা ধরনের অলংকার পুঁতির মালা আর কানে 'নাতং' নামে এক প্রকার দুল পরে।

উৎসব

ত্রিপুরা সমাজে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে উপলক্ষ্যে নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বাংলা বছরের শেষ দুদিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে ত্রিপুরারা 'বৈসু' উৎসব পালন করে। তখন গ্রামবাসীরা

পৃত্যরত ত্রিপুরা নারী

গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, আর কিশোরীরা কানে ফুল, গলায় টাকার ছড়া, পুঁতির মালা, হাতে 'কুচিবালা' ইত্যাদি পরে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। 'বৈসু' উৎসবের অন্যতম প্রধান ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হলো 'গরয়া নৃত্য'। ত্রিপুরা শিশুরা 'খিলা' (গিলা) বা 'সুকুই' নামে বিচি দিয়ে খেলতে ভালোবাসে যাকে তারা 'সুকুই থুংমুং' বলে। হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধাও তারা খেলে।

ওঁরাও

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী ইত্যাদি জেলায় ওঁরাও জাতিসত্তা বাস করে। তাদের বেশিরভাগের ভাষা 'কুড়ুখ'।

সমাজব্যবস্থা

ওঁরাও সমাজে বেশ কয়েকটি গোত্র রয়েছে। বাংলাদেশে তাদের তিনটি দল আছে যেমন– 'হাত সাঙ্গিয়া', 'ওপার সাঙ্গিয়া' ও 'কাত্রিয়'। ওঁরাও সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। গ্রামাঞ্চলে তাদের একজন গ্রাম প্রধান থাকে যিনি 'মাহাতো' নামে পরিচিত। ওঁরাওদের বাড়িঘর খুবই সাদামাটা হলেও সেখানে বিচিত্র নকশা আঁকা থাকে। ওঁরাও সমাজ কৃষিকর্মের ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়াও অনেকে কুলি বা দিনমজুরির কাজ করে।

কর্মরত ওঁরাও নারী

ধর্ম

ওঁরাও জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন দেবতার পূজা করে। তাদের মতে 'ধরমী' বা 'ধরমেশ' পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।

উৎসব

প্রতি মাসে ও প্রতি ঋতুতে ওঁরাওরা বিভিন্ন ধর্মীয় ব্রত অনুষ্ঠান পালন করে। তাদের প্রধান উৎসবের নাম 'ফাগুয়া' যা ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখে পালন করা হয়।

পোশাক

পুরষেরা ধুতি, লুঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি ইত্যাদি পরে। মেয়েরা মোটা কাপড়ের শাড়ি ও ব্লাউজ পরে।

খাদ্য

ওঁরাওদের প্রধান খাবার ভাত। এছাড়া তারা শাকসবজি, মাছ, পশুপাখির মাংস ও অন্যান্য খাবার খায়।

এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশে পাহাড় ও সমতলে বসবাস করা কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাথে পরিচিত হয়েছি। এছাড়া আরও বহু জাতিসত্তা রয়েছে। আমরা সবাই একসাথে লেখাপড়া ও খেলাধুলা করি। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করব। সবাই সবার উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব। একে অন্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানাব। বাংলাদেশকে আমরা সবাই ভালোবাসি। এ দেশের উন্নয়নে আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করব।

আবার পড়ি

১. আমাদের দেশে গারো, খাসি, ম্রো, ত্রিপুরা এবং ওঁরাও সহ আরও অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে।
২. প্রতিটি জাতিসত্তারই নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।
৩. আমরা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানাব।
৪. আমরা পরস্পরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানাব।

পরিকল্পিত কাজ

১. বিভিন্ন ধর্ম ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের নামের তালিকা তৈরি করা।
২. গল্প বা অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা, সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সমানুভূতি প্রকাশ।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ নিচের কোন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা 'আচিকমান্দি' নামে পরিচিত ?

ক. ম্রো খ. গারো
গ. ত্রিপুরা ঘ. ওঁরাও

১.২ ম্রো সমাজের মানুষ প্রধানত কোন ধর্মাবলম্বী ?

ক. খ্রিষ্ট খ. সনাতন

গ. সংসারেক ঘ. বৌদ্ধ

১.৩ বাংলাদেশে ওঁরাওদের কয়টি দল রয়েছে ?

ক. একটি খ. দুইটি

গ. তিনটি ঘ. চারটি

১.৪ কোনটি 'বৈসু' উৎসবের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ?

ক. 'গরয়া নৃত্য' খ. 'ফাগুয়া'

গ. 'ওয়াংগালা' ঘ. 'কের'

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম ——————।

খ. খাসি দের প্রধান দেবতার নাম ——————।

গ. ম্রো সমাজে বাড়িকে —————— বলে।

ঘ. নববর্ষে ত্রিপুরারা —————— উৎসব পালন করেন।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. 'ওয়াংলাই'	ম্রো সমাজের সুস্বাদু খাবার
খ. ওঁরাওদের সমাজব্যবস্থা	'নার'
গ. 'নাপ্পী'	পিতৃতান্ত্রিক
ঘ. খাসিদের জনগোষ্ঠী	'ওয়াংগালা'
ঙ. গারোদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম	'মাহাতো'
	ম্রো সমাজের মেয়েদের পোশাক

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. গারোদের বাসস্থানের বর্ণনা দাও।

খ. খাসিদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখ।

গ. ম্রো জাতিসত্তারা কোথায় কোথায় বসবাস করেন ?

ঘ. ত্রিপুরাদের উৎসবের বর্ণনা দাও।

ঙ. সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন কেন ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব

পৃথিবীতে বাংলাদেশসহ ১৯৬টি দেশ আছে। এর মধ্যে কোনো কোনো দেশ আমাদের দেশের আশেপাশে বা কাছাকাছি অবস্থিত। তবে বেশিরভাগই আমাদের দেশ থেকে দূরে অবস্থিত। নিজ দেশের বাইরে অবস্থিত এসব দেশকে বলা হয় বহির্বিশ্ব। নিজ দেশ ও বহির্বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়েই আমাদের এই পৃথিবী বা বিশ্ব।

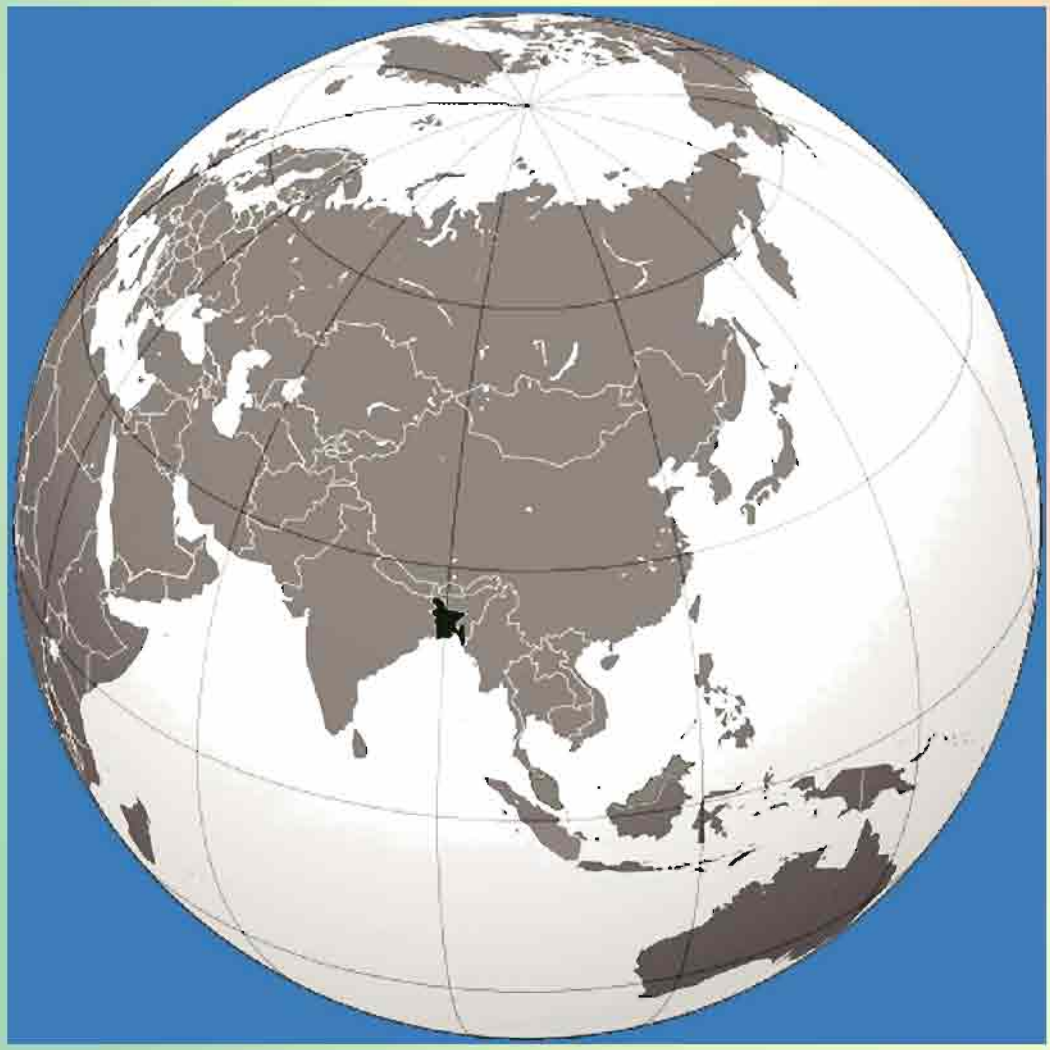

পৃথিবীর একটি রাজনৈতিক মানচিত্র।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব

বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব খুবই প্রয়োজন। মানুষ যেমন অন্যের সহযোগিতা ছাড়া সমাজে বসবাস করতে পারে না, তেমনি বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোও একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। বিশ্বের দেশগুলো বিভিন্ন দিক দিয়ে একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। এভাবেই দেশগুলোর মধ্যে গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক।

দেশগুলোর মধ্যে এ ধরনের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বের উন্নয়নে অপরিহার্য। দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিশ্বের জনগণকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে বিশ্বের দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা সংস্থা গঠন করে নিজ নিজ দেশের উন্নয়নে কাজ করছে। জাতিসংঘ ও সার্ক এ ধরনের সহযোগিতা সংস্থা। সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এটি একই অঞ্চলে এবং পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছে। অপরদিকে জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা। বিশ্বের যে কোন স্বাধীন দেশ এর সদস্য হতে পারে।

জাতিসংঘ

জাতিসংঘের পতাকা

বিশ্বে এ পর্যন্ত দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। এতে বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অনেকে। আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানে পারমানবিক বোমা ফেলার ভয়াবহতার কথা জানি। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। অনেকে আহত ও বিকলাঙ্গ হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশেরও হয়েছে অনেক ক্ষতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এ ভয়াবহতা বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মানুষকে ভীত করে তোলে। তারা উপলব্ধি করে যে মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়া উপায় নেই। ফলে বিশ্বের সব দেশের সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর গঠিত হয় জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক তথা বিশ্ব প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের যেকোন স্বাধীন রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।

জাতিসংঘের সদর দপ্তর

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

জাতিসংঘ কিছু মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
২. বিভিন্ন জাতি তথা দেশের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান গড়ে তোলা।
৫. বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ মীমাংসা করা।

উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। এর ছয়টি শাখা আছে। এগুলোর মাধ্যমে জাতিসংঘের বিভিন্ন কাজ পরিচালিত হয়। এখন আমরা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার গঠন ও কাজগুলো সম্পর্কে জানব।

সাধারণ পরিষদ

জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্র এর সদস্য। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩। জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ, নতুন কোন রাষ্ট্রকে সদস্য করা বা কোন রাষ্ট্রের সদস্য পদ বাতিল করা, এর বিভিন্ন শাখার সদস্য নির্বাচন, বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে সাধারণ পরিষদ। প্রতি বছরে একবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভোটে সাধারণ পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে।

নিরাপত্তা পরিষদ

এটি জাতিসংঘের প্রতিরক্ষা পরিষদ। বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব এ পরিষদের। এর পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র আছে। এগুলো হলো– যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও গণচীন। এছাড়া অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতি দুই বছরের জন্য দশটি রাষ্ট্রকে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশ দুইবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে নিরাপত্তা পরিষদ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা করে। এ চেষ্টা সফল না হলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি ব্যবহার করে। জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সামরিক বাহিনী নেই। জাতিসংঘ এর শান্তি রক্ষার কাজে সদস্য দেশগুলোর সামরিক শক্তি ব্যবহার করে।

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বসনিয়া, কুয়েত, কঙ্গো, সিয়েরালিয়ন প্রভৃতি দেশে নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশে শান্তি বজায় রাখতে গিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক বীরসেনা জীবন উৎসর্গ করেছেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

এ পরিষদের কাজ হলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম

পরিচালনা করে। বেকার সমস্যার সমাধান, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিশু অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষণ, নারী সমাজের উন্নয়ন ইত্যাদি এ পরিষদের অন্যতম কাজ।

অছি পরিষদ

পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাধীনতা দেয়া এবং দেশগুলো যেন নিজেরাই নিজেদের শাসন করতে পারে সেজন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য এ পরিষদ কাজ করে।

আন্তর্জাতিক আদালত

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে সীমানাসহ অন্য যেকোনো বিরোধ মীমাংসার জন্য এ আদালতে বিচার চাইতে পারে। আন্তর্জাতিক আদালত এ বিষয়ে যে রায় দেয় রাষ্ট্রগুলো তা মেনে নেয়। আন্তর্জাতিক আদালত মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানা সংক্রান্ত একটি বিরোধের রায় দেয় ২০১২ সালে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরে একটি বিরাট অংশের ওপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জাতিসংঘ সচিবালয়

জাতিসংঘের সকল প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার দায়িত্ব জাতিসংঘ সচিবালয়ের। জাতিসংঘ মহাসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে সচিবালয় পরিচালিত হয়। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম বান কি মুন। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক। জাতিসংঘের সকল প্রশাসনিক কাজ সচিবালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থার কাজ

আমরা জেনেছি জাতিসংঘ এর সদস্য রাষ্ট্রেগুলোর উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশে উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।এরকম কয়েকটি সংস্থা ও এদের কাজ সম্পর্কে এখন আমরা জানব।

ইউনিসেফ (UNICEF)

ইউনিসেফ বিশ্বের শিশুদের উন্নয়নে কাজ করে। পুরো নাম জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল। সংক্ষেপে একে বলা হয় জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বাংলাদেশসহ আরও অনেক দেশে এর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

ইউনিসেফ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, শিশুদের বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা দান ইত্যাদি কাজ

শিশুকে টীকা দেওয়া

করে। বিশ্বের শিশুদের অধিকার রক্ষায় ইউনিসেফ সজাগ দৃষ্টি রাখে।

বাংলাদেশে ইউনিসেফের সহায়তায় অনেক শিশু কল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হচ্ছে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, শিশুদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করা, শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করা এবং শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন কাজে ইউনিসেফ সহায়তা করে।

ইউএনডিপি (UNDP)

এর মূল কাজ বিভিন্ন দেশের উন্নয়নে কাজ করা এবং এ লক্ষ্যে জাতিসংঘ যে কাজগুলো করে তার সমন্বয়সাধন করা। বাংলাদেশে পরিবেশ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি কাজ করছে।

উন্নয়নমূলক কাজ

ইউনেস্কো (UNESCO)

শিশুসহ সকলের উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে। ইউনেস্কোর সদর দপ্তর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এর সদস্য। এটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য কাজ করে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা শহিদ দিবস বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের সুন্দরবন, ষাটগম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুরসহ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রক্ষায় ইউনেস্কো সহযোগিতা করছে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)

খাদ্য হচ্ছে মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা। পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব আছে। বিশ্বকে খাদ্য সমস্যা থেকে মুক্ত করার জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা গঠিত হয়েছে। ইতালির রোমে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা মোকাবেলা ও

খাদ্য বিতরণ

জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নে কাজ করে। এ সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র'। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্য ঘাটতি হলে এই সংস্থা আমাদের খাদ্য সরবরাহ করে থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

বিশ্বের সকল মানুষের স্বাস্থের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জন্মলাভ করে। স্বাস্থ্য ও রোগ ব্যাধি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা, স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া এই সংস্থার প্রধান কাজ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে স্বাস্থ্য রক্ষার

স্বাস্থ্যসেবা

প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রতিবছর ৭ই এপ্রিল তারিখে এর উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ এর সদস্য। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থার কাজের ফলে বিশ্ব থেকে গুটি বসন্ত রোগ দুর করা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক (WB)

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বিশ্বব্যাংক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে শিক্ষা, যোগাযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড

সার্ক এর লোগো

সার্ক (SAARC)

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সাতটি দেশ নিয়ে ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর সার্ক গঠিত হয়। পরবর্তীতে আফগানিস্তান যোগ দেয়। দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ বর্তমানে এর সদস্য। দেশগুলো হলো– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। সার্ক এর পুরো নাম 'দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা'। ইংরেজিতে একে বলা হয় সাউথ এশিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (South Asian Association for Regional Co-operation)। সংক্ষেপে একে বলা হয় 'সার্ক' (SAARC)।

সার্ক গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত চেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই হচ্ছে সার্ক এর প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া এটি গঠনের আরও

কিছু উদ্দেশ্য আছে। এগুলো হলো–

১. সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন করা।

২. দেশগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা।

সার্ক দেশগুলোর মানচিত্র

৩. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে দেশগুলোর উন্নয়ন সাধন করা।

৪. দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ও পরস্পর মিলেমিশে চলা।

৫. সদস্য দেশগুলোর স্বাধীনতা রক্ষা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা।

৬. এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

আবার পড়ি

১. বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা অপরিহার্য । এজন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা।
২. জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।
৩. সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর প্রধান লক্ষ্য।

পরিকল্পিত কাজ

১. মানচিত্র দেখে সার্কভুক্ত দেশগুলো সনাক্ত করা।
২. জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কাজের তালিকা তৈরি করা।
৩. গণমাধ্যম থেকে সার্ক ও জাতিসংঘের কয়েকটি সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের তালিকা তৈরি করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য কী ?
ক. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা খ. শিশুদের উন্নয়ন
গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘ. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন

১.২ সদস্য দেশগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কোন সংস্থার লক্ষ্য ?
ক. জাতিসংঘ খ. সার্ক
গ. ইউনিসেফ ঘ. ইউনেস্কো

১.৩ কোনটি বিশ্বব্যাংক এর কাজ ?
ক. খাদ্য চাহিদা পূরণ খ. বিশ্বের জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন
ঘ. মহাসচিব নিয়োগ ঘ. ঋণ ও সাহায্য প্রদান

১.৪ জাতিসংঘের প্রশাসনিক কাজ করে কোন শাখা ?
ক. সাধারণ পরিষদ খ. অছি পরিষদ
গ. জাতিসংঘ সচিবালয় ঘ. নিরাপত্তা পরিষদ

১.৫ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন কাজ পরিচালনা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব কার ?
ক. ইউএনডিপি খ. এফএও
গ. ইউনেস্কো ঘ. বিশ্বব্যাংক

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো একে অপরের ———————— ছাড়া চলতে পারে না ।

খ. দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা বিশ্ব ———————— প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

গ. সার্ক এর লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর ———————— মান উন্নত করা।

ঘ. বিশ্বে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ———————— পরিষদের।

ঙ. ইউনিসেফ বিশ্বের ———————— উন্নয়নে কাজ করে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয়	২০১২ সালে
খ. মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধের রায় দেয়	সার্ক
গ. জাতিসংঘের মহাসচিব	১৯৭৪ সালে
ঘ. আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা	দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক
	আন্তর্জাতিক আদালত

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা প্রয়োজন কেন ?

খ. সার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কী ?

গ. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার কারণ উল্লেখ কর।

ঘ. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সদস্য দেশগুলোর উন্নয়নে কী কাজ করে ?

ঙ. সার্ক ও জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের পার্থক্য লিখ।

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য বা বি- ৫

ভাবিয়া করিও কাজ,
করিয়া ভাবিও না

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত– বিক্রয়ের জন্য নয়।